অলৌকিক রহস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়



অলৌকিক রহস্যে রামকৃষ্ণ

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৯০
আগস্ট ১৯৮৩
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
মুদ্রাকর
পরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

দশ টাকা

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ

সমীপেষু

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণের যোগবিভূতি বা দৈবীশক্তির কিছু নিদর্শন এই বইতে চয়ন করে দেয়া হয়েছে। তাঁর বাণী ও জীবন নিয়ে, ভারতের সনাতন ধর্মকে ঠাকুরের প্রচার করা নিয়ে এবং আলোচনা ও গবেষণার অন্ত নেই। তার মধ্যে তাঁর অতিলৌকিক ক্ষমতার বিষয়টি স্বভাবত স্থান পায় না। তার অন্যতম কারণ, তিনি স্বয়ং অনীহা প্রকাশ করেছেন এ ব্যাপারে। 'এসব হঠযোগের ক্রিয়া শিখলে ও করলে শরীরের দিকেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।' সিদ্ধাইয়ের দিকে যেন মন আকৃষ্ট না হয়, এজন্যে তিনি সতর্ক করতেন সকলকে। সেই দুই ভাইয়ের গল্প শোনাতেন—যার এক ভাই বারো বছর কঠোর সাধনায় যে বিভূতি লাভ করে তার দাম 'আধ পয়সা।'

ধর্মক্ষেত্রে অলৌকিক রহস্যের মূল যে অকিঞ্চিৎকর তা ঠাকুর নানাভাবে জানিয়েছেন! কারণ যোগৈশ্বর্য বাধা হতে পারে ঈশ্বরলাভে। আর ভগবানকে পাওয়াই ত সত্যিকার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অথচ সেই অতিলৌকিক শক্তি তাঁর নিজেরই ছিল বিলক্ষণ। এতখানি ক্ষমতার অধিকারী হয়েও যে তিনি এমন নিস্পৃহ ছিলেন, তা থেকে তাঁর মাহাত্ম্য আরো উপলব্ধি করা যায়। তাঁর এই প্রসঙ্গটি নিয়ে এ যাবৎ কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। সেই অভাববোধও বর্তমান পুস্তকটি প্রকাশের এক কারণ। আর যাঁরা অবিশ্বাসী বা অজ্ঞ, এই পর্যালোচনা থেকে ভারতীয় অধ্যাত্ম সম্পদের কিছু আভাস তাঁরা পেতে পারেন।

আর একটি কৈফিয়ৎ আছে আমার নিজের পক্ষে। গত কয়েক

বছরের শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যানে কয়েকটি কাজ করেছি, ক্ষুদ্র সাধ্যে। প্রথমে 'সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ'—তাঁর গানের প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। তারপর 'কথায় রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ'-তে চারটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল—তাঁর আলাপচারি, বিচার ও বিতর্ক ; প্রশ্নোত্তরে তাঁর জ্ঞানী সত্বার প্রকাশ ; তাঁর ভাষণ রত্নমালা এবং রহস্য কৌতুক পরিহাস। এক কথায়—বাকপতি শ্রীরামকৃষ্ণ। আর একটি বই—'শিল্পদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ'—তাঁর নান্দনিক সত্বার বিভিন্ন দিকের পরিচয়। তাঁর সৌন্দর্য দৃষ্টি, লৌকিক ও অতিলৌকিক পর্যায়ে সুন্দরের অনুধাবন, তাঁর অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, মূর্তিগঠন, সঙ্গীতাদি নন্দন-গুণের আনুপূর্বিক পর্যালোচনা। 'কথায় কথায়' পুস্তকে আছে তাঁর কথিত গল্পগুলি নীতি-কথা যুক্ত করে সাজানো। আর বর্তমান বই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে অন্য একটি লেখাও শেষ হয়েছে। সে বইখানি বেরুবে আগামী বছরে।

ঠাকুরের যোগবিভূতি প্রকাশ পায় ঘনিষ্ঠ ভক্ত, চিহ্নিত শিষ্য, শ্রীমা প্রমুখের কাছে। বিবরণগুলি নেয়া হয়েছে সুপরিচিত প্রামাণিক গ্রন্থ-গুলি ('পুঁথি', 'লীলাপ্রসঙ্গ') থেকে। সেজন্যে সূত্র নির্দেশ সর্বত্র দেয়া হয়নি। তবে জানানো হয়েছে বিশেষ তথ্যের প্রয়োজনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা তাঁরই অতিলৌকিক প্রসঙ্গে স্মরণ করা রইল। ইতি

রথযাত্রা ১৩৯০
১২ জুলাই ১৯৮৩ — দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
ললিত নিলয়
৩৯ একবালপুর রোড
কলকাতা ২৩

বিষয় সূচী

লেখকের অন্য কয়েকটি গ্রন্থ

শিল্পদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ
কথায় রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ
সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ
ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরাণার ইতিহাস
বাঙালীর রাগসঙ্গীত চর্চা
দরবার নটী কলাবন্ত (প্রথম পর্ব)
বিচিত্র প্রতিভা
আসরের গল্প
ভারতের সঙ্গীতগুণী (প্রথম খণ্ড)
" " (দ্বিতীয় খণ্ড)
" " (তৃতীয় খণ্ড)
বিষ্ণুপুর ঘরাণা
সঙ্গীতের আসরে
সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু
কথায় কথায়
এশিয়ার রূপকথা
শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলা
একদা যাহার বিজয় সেনানী
CHAITANYA

মথুরমোহনের অভিজ্ঞতা

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের যোগ বিভূতির বিষয়ে কাউকে জানাতেন না বা বলতেন না। দেখাতেও চাইতেন না কারো কাছে। অলৌকিক রহস্যের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তবু কখনো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়ে তাঁর দৈবী শক্তি। এতই তাঁর যোগৈশ্বর্য।

স্বামী সারদানন্দ যে বলেছেন—ঠাকুরের ফুলের আগেই ফল। তাঁর যোগের বিষয়েও সেকথা সত্য। যোগ সাধন না করেও তিনি সিদ্ধ। আজন্ম মহাযোগী। যোগীর রাজা তিনি।

যোগ বিভূতির প্রতি তাঁর নিজের কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি চাইতেন না এসব ঐশ্বর্য। কিন্তু বিভূতি বা শক্তি যেন তাঁকে আশ্রয় করত। প্রকাশ হয়ে পড়ত তাঁর বচনে ও আচরণে। কখনো কোন সেবকের একান্ত প্রার্থনায়। কখনো বা তাঁর আপন লীলায়। কখনো শিষ্যের প্রতি স্নেহ। কখনো বা আর্তের প্রয়োজনে। কখনো শিষ্যের বিশ্বাস জাগাতে কিংবা সাধনের সহায়তায়।

সেইসব সময় ঠাকুরের এক একটি অতিলৌকিক সংঘটন ঘটে যায়। স্মৃতি এত ব্যাপক, এত সুপরিণত হয় যে তিনি জানতে পারেন উদ্দিষ্টের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। অদ্বৈতভাবে জ্ঞান স্বরূপে জাতিস্মর হন। দুই স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন একই সময়ে। কোথাও স্থূল দেহে, কোথাও জ্যোতির্ময় রূপে বা সূক্ষ্ম শরীরে। অলৌকিক মার্গে তখন গমনাগমন।

কখনো আপন দিব্য প্রভাবে আপনাকে দিব্য ভাবে অবস্থান করান। কখনো শিষ্যকে দেখিয়ে দেন বিগ্রহের চৈতন্যময় রূপ। কখনো দেহান্তের পরেও কারো সামনে আবির্ভূতা, কখনো তাঁর ইচ্ছা প্রয়োগে কারো আধি ব্যাধি নিরাময় হয়ে যায়। কখনো দিব্য অনুভব জাগান কাউকে স্পর্শ করে দিয়ে!

কখনো কোন মুক্তিকামীকে কি দুর্নিবার তাঁর আকর্ষণ। দক্ষিণেশ্বরে এসেই সে ব্যক্তির মার্গ মিলে যায়। কখনো নন্দনগুণ সৃজন করেন কারো স্বভাবে। কখনো বিভ্রম জাগিয়ে কারো অপমৃত্যু রোধ করে দেন।

কখনো কাউকে লোকোত্তর দৃশ্য দেখান লীলাবিলাসে।

মথুরমোহনের এমনি কোন কোন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ঠাকুরের কিছু যোগৈশ্বর্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পান তিনি।

আর মাথুরমোহনের প্রসঙ্গেই নিজের বিভূতির কথা শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর পরেকার সেই কথা।

মথুর যে কত বছর তাঁর সেবা করেছিলেন, কেমন আন্তরিক সেবক ছিলেন সেসব কথাই সেদিন বলছিলেন। তখনই শ্রীমুখে প্রকাশ পায় নিজের যোগ বিভূতির কথা।

তবে তিনি 'যোগৈশ্বর্য' বা 'আলৌকিক' এমন ভাবে উল্লেখ করেন নি। বলেছিলেন তাঁর নিজস্ব, ঘরোয়া ভাষায়—'নানা প্রকার অদ্ভুত সব।'

মথুরমোহন নানা দিনে, নানা ধরনের ঠাকুরের বিভূতি দেখান। বেশির ভাগই দক্ষিণেশ্বরে। কখনো বা জানবাজারে, অর্থাৎ রাণী রাসমণির বাড়িতে।

অনেকের আগেই তিনি ঠাকুরের মাহাত্ম্য জানতে পারেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আসার কিছুকালের মধ্যেই।

মথুরমোহন বিশ্বাস। অপুত্রক রাণী রাসমণির প্রিয় জামাতা। সুযোগ্য, বিচক্ষণ, কর্মঠ, বিষয়বুদ্ধির অধিকারী। শুধু দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নয়, রাসমণির বিশাল জমিদারি ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, ভারপ্রাপ্ত তিনি। রাণীর বিশেষ আস্থাভাজন। কার্যত সেই বিপুল সম্পদের স্বত্ববান। রাসমণির অবর্তমানে তার সামগ্রিক কর্তা। রাণীর জীবিতকালেও তেমনি প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁর। সুতরাং কলকাতার এক বিশিষ্ট ধনী তিনি। আর বলা বাহুল্য, প্রখর তাঁর বাস্তব-বুদ্ধিও।

সেই মথুরবাবু হলেন তাঁর প্রধান 'রসদদার', শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাষায়। 'তিন চার জনের' অন্যতম। অন্যেরা হলেন—শম্ভুচরণ মল্লিক, বলরাম বসু ও সুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মথুরমোহন ১৮৫৭ থেকে ১৮৭১ (তাঁর মৃত্যু সন) পর্যন্ত ঠাকুরের সযত্ন সেবা, পরিচর্যা করেছিলেন দৈনন্দিন নানা বিষয়ে। পশ্চিমাঞ্চলে (১৮৬৮) তীর্থভ্রমণেও সহযোগী। ঠাকুরের প্রয়োজন ও ইচ্ছার তাৎক্ষণিক, যথাসাধ্য, সশ্রদ্ধ পূরণে।

তাঁর সম্পর্কে ঠাকুরের সেই স্মরণীয় উক্তিটি হল—

'মথুর যে চৌদ্দ বছর সেবা করে, তা কি অমনি করে, তা কি অমনি করে? মা তাকে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এর ভিতর দিয়ে নানা প্রকার অদ্ভুত সব দেখিয়ে দিলেন, সেজন্যেই সে এত সেবা করেছিল।'

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নানা ধরনের দৈবীশক্তি দর্শনে ভক্তিমান সেবক হন মথুরবাবু।

তার মধ্যে কয়েকটি বিভূতি তিনি দেখেন রাসমণির জীবিতকালেই। অর্থাৎ ১৮৬১ সালের আগে।

প্রথম দিনের কথা! ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছেন মথুর।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। অন্য সকলের সঙ্গে যেমন, এখানেও প্রধান কথক ঠাকুরই। তিনি বল্‌ছেন এইভাবে—মায়ের (অর্থাৎ জগজ্জননীর) ঐশ্বর্য কি বিপুল। তার শেষ নেই। অনন্ত তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। তাঁর সম্পদের পরিমাপ কে করতে পারে? কে বুঝবে তাঁর তত্ত্ব বা রহস্য! তাঁর সৃজনের মধ্যে বড় ছোট নয়। সকলেরই মূল্য আছে। সবই বিশিষ্ট।

বলতে বলতে তিনি একটি জবা ফুলের গাছ দেখে দাঁড়ালেন। আর সেদিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—এই যে জবা গাছটি তোমার সামনে, এর মধ্যে কি কারিগরি দেখ। ফুল, পাতা থেকে গুঁড়ি পর্যন্ত কি আশ্চর্য-ভাবে গড়ে উঠেছে। কত রকমের রঙ তাদের। প্রত্যেকটিই আলাদা। আবার দেখছ, সমস্ত গাছটিতে লাল জবা ফুটে আছে। কিন্তু মায়ের কি লীলা। তিনি ত ইচ্ছাময়ী। ইচ্ছা করলেই এই লাল জবার গাছে সাদা ফুলও ফোটাতে পারেন।

একথায় মথুরবাবু প্রতিবাদ করলেন—তা কি করে সম্ভব? রক্ত-জবা গাছে সাদা জবা ফুটবে কি করে?

ঠাকুর উত্তর দিলেন—হ্যাঁ গো, কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরী যে। তাঁর সৃষ্টিতে কত মহা ঐশ্বর্য। তিনি ইচ্ছা করলে সবই পারেন। সমস্ত সৃষ্টিই ত তাঁর হাতে। তাঁর কর্তৃত্বে।

বলেই, কুইন ভিক্টোরিয়ার নাম করলেন, উপমা স্বরূপ—এদেশের রাণী এখন ভিক্টোরিয়া। তিনি কত আইন করেছেন। আবার আজ যে আইন আছে, কাল ইচ্ছা হলে তিনি তা বদলাতে পারেন। সে জায়গায়

নতুন আইন করতে পারেন। এখানেও তেমনি। ইচ্ছাময়ী মা কালীর যা ইচ্ছা তাই সম্ভব।

মথুর বললেন—এ ত অদ্ভুত কথা। প্রকৃতির নিয়ম চিরদিন ত একই রকম জানি। তা তোমার কথা সত্য বলে জানতে পারি যদি এই রক্তজবা গাছে সাদা ফুল ফোটে।

সেদিন এবিষয়ে আর কিছু কথা হল না।

তার পরের দিনও ঠাকুর মন্দির চত্বরে এসেছেন। মথুরবাবুও রয়েছেন সঙ্গে। ঠাকুর খানিকক্ষণ এদিক ওদিকে বেড়ালেন। তারপর এসে দাঁড়ালেন সেই জবা গাছটির সামনে। তার ডালে ডালে লাল ফুল ফুটে আছে! কিন্তু একটি বৃন্তে—আশ্চর্য ব্যাপার!—লাল জবার পাশে একটি সাদা জবা।

সেদিন ঠাকুর মথুরকে দেখালেন। ছদ্ম বিস্ময়ে বললেন—একি, এক বোঁটায় লাল সাদা দু'রকম জবাই যে রয়েছে!

মথুরবাবু হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে! তিনি মনে মনে বুঝলেন, কার জন্যে এমন অঘটন সম্ভব হয়েছে!

তারপর থেকে তিনি আর ঠাকুরের কোন কথার প্রতিবাদ করতেন না। অবিশ্বাস জানাতেন না।

কিন্তু আরো কত অলৌকিক দেখার যে বাকি ছিল তখনো! বিভূতি দর্শনের সেই ত তাঁর সূচনা!

আর একদিন ঠাকুর ধ্যানে বসেছেন। পঞ্চবটিতে গভীর ধ্যান-মগ্ন তখন। মথুরবাবু দূর থেকে দেখে এগিয়ে এলেন। চুপিসারে এসে তাঁকে দেখতে লাগলেন—যেন স্বয়ং শিব যোগাসনে! দেখে তাঁর মনে এক অপূর্ব পুলক জাগল। কি প্রশান্ত, অচঞ্চল ধ্যানী মূর্তি। অপরূপ

জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুখ।

মথুরবাবুর মনে হল, ঠাকুরের সবই অলৌকিক। তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়বার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সে উচ্ছ্বাস দমন করলেন ধৈর্য ধরে। ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাস আরো জাগ্রত হল। তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন আরো যোগ বিভূতি দর্শনের আশায়। আর সে সুযোগও তাঁর অতি শীঘ্র এল। ঠাকুরই হয়ত সে কৃপা করলেন ভক্তের বিশ্বাস অটুট রাখতে।

তাঁকে এবার ইষ্টের বেশে দেখা দিলেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চত্বরেই।

মথুরমোহন শাক্ত। শিব তাঁর আরাধ্য দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন সেকথা। এদিনের অতিলৌকিক ঘটনাও সেইজন্যে।

মন্দিরের যেদিকে ঠাকুরের কক্ষ, ঘটনাস্থল তার কাছেই। তাঁর ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি বারান্দা। পূর্ব ও পশ্চিমে সেটি দীর্ঘ। তারও উত্তর দিকে সুন্দর ফুলবাগান। নানা সুগন্ধী পুষ্প সেখানে ফুটে রয়েছে। তারই এক পাশে কর্তৃপক্ষের যে বাড়ি, তার সিঁড়িতে বসে আছেন মথুরবাবু।

সেই নিরিবিলিতে তিনি নানা কথা ভাবছিলেন। এমন সময় তাঁর চোখ পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে। তিনি বারান্দাটিতে পায়চারি করছেন। আপন মনে যাচ্ছেন আসছেন এদিক থেকে ওদিকে। আপনার ভাবে বিভোর। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

কিন্তু মথুরবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, তাঁর দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে! এক অকল্পনীয় দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে! ঠাকুরের অঙ্গে দেব-দেবীর অধিষ্ঠান :—

ঠাকুর যখন পশ্চিমদিকে মুখ করে পদচারণা করছেন, তখন তাঁর মধ্যে শিবমূর্তি প্রকাশ পাচ্ছে। আবার যখন তিনি পূর্বদিকে মুখ ফেরাচ্ছেন, তখন তাঁর কালী রূপ। যেন মন্দিরের মধ্যে অবিকল দেবী বিগ্রহ। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে শিব কালী যুগ্ম রূপ যুগপৎ প্রকটিত।

প্রথমে মথুর ভাবলেন—নিশ্চয় তাঁর বিভ্রম বা চোখের ভ্রম। তিনি বার বার দেখলেন—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কিন্তু প্রতিবারই এই যুগল দর্শন!

নিজের চক্ষুকে আর অবিশ্বাস করার উপায় নেই। সঠিক দেখছেন তিনি। মহাভাগ্যবলে এই স্বর্গীয় দৃশ্যের দর্শক। ঠাকুরের অহেতুক কৃপায়।

তাঁর অন্তর আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি আকুল হয়ে ছুটে এলেন ঠাকুরের কাছে। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন কাঁদতে কাঁদতে।

তাও এক দর্শনীয়। সর্বত্যাগী পূজারীর চরণতলে ক্রন্দনরত রাণী রাসমণির এস্টেটের হর্তাকর্তা!

ঠাকুর এবার নেমে এলেন বাস্তবে। তাঁকে হাত ধরে ওঠালেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'একি করছ? তুমি এত বড় মান্য গণ্য। রাণীর জামাই। এখন তোমার এই অবস্থা দেখলে সবাই কি ভাববে।'

কিন্তু মথুরবাবু নিরস্ত হলেন না। তাঁর কান্নাও থামল না। পা জড়িয়েই রইলেন।

ঠাকুর যেন কিছুই জানেন না, এমন ভাবে বললেন, 'কি হয়েছে বল ত শুনি। এরকম করছ কেন?'

মথুরের তখনো অভিভূত অবস্থা। ভাল করে কথা ফুটছে না মুখে। তবু সবই তাঁকে জানালেন, যা যা দেখেছেন স্বচক্ষে! এই মাত্র!

বিস্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বললেন, 'এসব তুমি কি বল্‌ছ ? আমি ত বাপু কিছুই জানিনা !'

মথুরবাবু সেকথা শুনলেন না। অর্থাৎ স্বীকার করলেন না। চেয়েই রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে। আর তাঁর পাও ছাড়লেন না।

ঠাকুর অনেকক্ষণ বোঝালেন তাঁকে। ধৈর্য ধরতে, শান্ত হতে বললেন।

অবশেষে সুস্থির হলেন মথুরবাবু।

তারপর তিনি হাত জোড় করে ঠাকুরকে বললেন, 'এবার সব আমি বুঝতে পেরেছি। এতদিনে আমার কোষ্ঠীর ফল ফলে গেল।'

তাঁর ঠিকুজিতে ছিল, সশরীরেই ইষ্ট থাকবেন তাঁর সঙ্গে।

সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষাৎ প্রমাণ আজ পেলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা অবিচল রইল এখন থেকে।

তার ক বছর পরের কথা।

এর মধ্যে ঠাকুরের অন্যান্য মতের সাধন সম্পূর্ণ হয়েছে। তারপর মথুরবাবু তীর্থ পর্যটনও করিয়ে এনেছেন তাঁকে। বৈদ্যনাথ, বারাণসী, বৃন্দাবন, মথুরায় তীর্থ করেছেন। তারপর থেকে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের মাহাত্ম্যও কিছু প্রকাশ পেয়েছে সাধু সমাজে এবং সাধারণের মধ্যেও। কলকাতায় কেউ কেউ তাঁর কথা জেনেছেন। কিছু ভক্ত আসতে আরম্ভ করেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সময়টি ১৮৬৯ সাল কিংবা কাছাকাছি।

এমন সময় হৃদয়রামের মনে আধ্যাত্মিক আকুলতা জাগল। ঠাকুরের ভাগিনেয় তিনি। দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন অনেক আগে থেকে। হৃদয়ের সে প্রসঙ্গ তাঁর অধ্যায়ে বলা হবে। এখানে সে সম্পর্কে মথুরবাবুর বিষয়ও কিছু আছে।

তখন একদিন হৃদয় বসেছেন পূজায়। আর তাঁর মধ্যে জেগেছে দর্শন অনুভবের ভাব। অর্ধ বাহ্যদশায় তিনি রয়েছেন। এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন মথুরবাবু।

হৃদয়কে সেই অবস্থায় দেখে, তিনি ভাল করে লক্ষ্য করলেন। আর ব্যাপারটিও একরকম অনুমান করেছিলেন।

আর সরাসরি ঠাকুরের কাছে এসে বললেন, 'বাবা, এ নিশ্চয় তোমার কাজ। তুমিই হৃদয়কে এমন উচ্চ অবস্থায় তুলে দিয়েছ।'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'হৃদয় বোধহয় মার কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাই ভাব পেয়েছে।'

ভক্ত মথুর বললেন, 'না বাবা। এ তোমারই খেলা। অন্য কারো এমন সাধ্য নয়। তুমিই হৃদয়কে ভাব দিয়েছ।'

এবার তাঁরও প্রার্থনা হল ঠাকুরের কাছে, 'আমার ওপর আপনি কৃপা করুন। আমি যেন অমনি ভাব পাই। ভাবে থাকতে পারি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে রাজি হলেন না। ওরকম ভাবে থাকার অনেক অসুবিধা মথুরের মতন ব্যক্তির পক্ষে। কাজকর্মের ক্ষতি হবে। বৈষয়িক অনেক দায়িত্ব তাঁর। ঠাকুর নিজে সদা ঈশ্বর-সান্নিধ্যে থাকেন বটে কিন্তু তাঁর বাস্তববোধ বিলক্ষণ। সংসারীর দৈনন্দিন জীবন, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদিতে বিচক্ষণ তিনি। মথুরবাবু এখন হৃদয়ের ভাব দেখে আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তিনি ভোগী, সুখলালিত; এ ভাব ধারণ করে রাখতে পারবেন না—এসবই বুঝলেন ঠাকুর। তাই তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলেন অনেক বুঝিয়ে।

কিন্তু মথুর জিদ ধরে রইলেন। তাঁর কাছে আবদার করতে লাগলেন—হৃদয়ের মতন ভাব যেন তাঁরও হতে পারে।'

অগত্যা ঠাকুর বললেন, 'মার ইচ্ছা হলে তখন হবে।'

তিনি স্বীকার হলে এই ধরনেই বলেন, তা মথুরের জানা। তাঁর মুখের এই কথা যে যথেষ্ট, প্রার্থনা পূরণ হওয়া—তা বুঝলেন মথুরবাবু। মনোবাঞ্ছা এখন পূর্ণ তাঁর। তিনি পুলকিত মনে গৃহে চলে গেলেন।

পরের দিনই হল তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষিত আবেশ। মন উচ্চ গ্রামে উঠে গেল। আর তা নামল না নিচে।

প্রথমে সেই আনন্দলোকে বেশ রইলেন। ভাবে মগ্ন। মানস আকাশে ঊর্ধ্বচারী।

কিন্তু সেই ভাব রাখা কঠিন হয়ে উঠল ক্রমে। যুগপৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল। নানা ঘাত-প্রতিঘাত চলতে লাগল অন্তরে।

একদিকে তিনি ধনশালী, ভোগপরায়ণ ব্যক্তি। কামনা বাসনা পূর্ণ বিলাস-জীবনেও অভ্যস্ত। সেই সঙ্গে এতবড় জমিদারী, বিষয় সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হয়ে আছেন। বহু পরিজন সমেত বৃহৎ পরিবারের কর্তৃত্ব তাঁর স্কন্ধে। সাংসারিক, বৈষয়িক কত দায়িত্ব কর্তব্যের বাঁধন তাঁকে ঘিরে। সে সমস্তই নিচের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল।

দারুণ দোটানায় পড়ল মথুরবাবুর ঊর্ধ্বগামী সত্তা। দৈবীভাব ও বিরুদ্ধভাবের সংঘাতে তিনি বিপর্যস্ত বোধ করলেন। আর থাকতে পারলেন না এই অবস্থায়।

নিরুপায়ে তিনি ঠাকুরের কাছে সংবাদ পাঠালেন।

তিনিও এলেন মথুরের কাছে। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বও বুঝলেন। আবার দেখলেন তাঁর বাহ্য আবিষ্ট রূপ। মুখে বুকে লাল আভা। সারা অঙ্গে ভাবের লক্ষণ প্রকট।

কিন্তু তাঁর যে প্রতিক্রিয়ার কথা ঠাকুর আগেই ভেবেছিলেন তা-ই

ঘটল।

তাঁকে দেখে মথুরবাবু তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবা, তোমার এই ভাব ফিরিয়ে নাও। এ আমি ধারণ করতে পারছি না। মর্ম না বুঝে আমি ভাব প্রার্থনা করেছিলুম। আর কখনো চাইব না। আমার বিষয় সম্পত্তি সব নষ্ট হয়ে যাবে এই ভাব থাকলে। এমন মহা ভাব তোমাতেই সাজে। আর কারো নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আর কিছু বললেন না। তাঁর সেই ভাব ভাঙিয়ে দিলেন বুকে স্পর্শ করে। মথুরবাবু শান্ত হলেন। স্বাভাবিক হয়ে এল তাঁর অঙ্গের বর্ণ। আবেশ চলে গেল। তিনি নিস্তার পেলেন নিজের প্রকৃতি ফিরে পেয়ে। সঙ্কট মুক্ত এতক্ষণে।

ঠাকুরই ভাব দিয়েছিলেন। তিনিই ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর এই দৈবী শক্তি বিলক্ষণ বুঝলেন মথুরবাবু।

ঠাকুরের আরেকটি বিভূতির কথাও বলা যায়। মথুরমোহন অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন সেবার। তাঁর পত্নীর প্রাণ-সংশয় দেখা দেয়। তখনকার কথা। তার আগে আছে একটু পারিবারিক বিবরণ।

মথুরবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী জগদম্বা। তিনিও রাসমণির কন্যা। মথুরবাবুর প্রথমা পত্নী ছিলেন করুণাময়ী, রাসমণির অপর কন্যা জগদম্বার অগ্রজা। করুণাময়ী অকালমৃতা হন। তারপরে মথুরবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ হয় রাসমণির তৃতীয়া কন্যা জগদম্বার সঙ্গে। সেই সূত্রে তিনি রানী রাসমণির পরিবারে 'সেজোবাবু' নামে কথিত হতেন। ঠাকুরও তাঁকে অনেক সময় উল্লেখ করেছেন সেজোবাবু বলে।

জগদম্বার সঙ্গেই মথুরবাবু অধিককাল দাম্পত্য জীবনযাপন করেন। তিনিই সেবার আক্রান্ত হন গ্রহণী রোগে। ব্যাধি অতি কঠিন, দুরারোগ্য

হয়ে পড়ে। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরাও জবাব দিয়ে দেন তাঁদের অসাধ্য বলে।

মথুরবাবু দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। সঙ্কট তাঁর আরো এইজন্যে যে, জগদম্বার মৃত্যু হলে তিনি রাসমণির সম্পত্তিতেও কর্তৃত্ব হারাতে পারেন।

বৈদ্যরা যখন অক্ষমতা জানালেন, মথুরবাবু এসে ঠাকুরের পায়ে পড়লেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে বললেন, 'আমার সব যেতে বসেছে। বাবা, তোমার সেবার অধিকার থেকেও এবার বঞ্চিত হব।'

সব কথা ঠাকুরকে তিনি বললেন। পত্নীর প্রাণের আর কোন আশা নেই।

ঠাকুরের করুণা হল। তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন, 'ভয় নেই। তোমার স্ত্রী সেরে যাবে।'

মথুরমোহন দেবতাই জ্ঞান করতেন তাঁকে। তাঁর অভয়বাণী পেয়ে গৃহে ফিরে গেলেন। ঘরে এসে দেখেন, স্ত্রীর অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। সেদিন থেকেই ভালোর দিকে যেতে থাকেন। আর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নিরাময় হলেন জগদম্বা।

কিন্তু ঠাকুরের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া ঘটল। ওই রোগ ভোগ হতে লাগল তাঁর দেহের ওপর দিয়ে। প্রায় ছ মাস তিনি উদরের যন্ত্রণা পেতে থাকেন। কঠিন আমাশয়ও তাঁর হয় এ সময়।

তারপর আর এক প্রসঙ্গ। আরো ক বছর পরের কথা। তখন মথুরবাবুরই অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সে সময় আর একবার প্রকাশ পায় ঠাকুরের সিদ্ধাই। কিন্তু তা অন্যভাবে। তার বিবরণ এই--

১৮৭১ সাল। সেবার বর্ষাকালটি বড় দুর্যোগ হয়ে দেখা দেয়। কলকাতায় জল হাওয়া খারাপ হয়। বহুলোক নানা রোগ-ভোগ

করতে থাকে। তখন মথুরবাবু শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন জ্বর-বিকারে। আর তা-ই তাঁর কাল-ব্যাধি হল। চিকিৎসকেরা ব্যর্থ হলেন সে রোগ নিরাময়ে। আত্মীয়স্বজনরা তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করলেন।

ঠাকুরের এমন প্রিয় ভক্ত ছিলেন মথুরবাবু। এক যুগেরও বেশি ঠাকুরের সহৃদয় অনুগত সেবক তিনি। তাঁর প্রাণ-সংশয় অবস্থা দাঁড়াল। তবু ঠাকুর দেখতে গেলেন না একদিনও। তিনি বুঝেছিলেন, মথুরের কাল পূর্ণ হয়েছে। তাই হৃদয়কে প্রত্যহ জানবাজারে পাঠাতেন মথুরের বার্তা আনতে।

অবশেষে সেবকের অন্তিমক্ষণ ঘনিয়ে এল। বন্ধ হয়ে গেল কথা। ক্ষীণ ধমনী সঙ্কেত জানিয়ে দিলে।

চরম অবস্থা বুঝে আত্মীয়-পরিজনেরা তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করালেন। কালীঘাটে আনা হল মথুরবাবুকে।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থেকেই অবহিত হলেন। সেদিন আর হৃদয়কে সংবাদ নিতে পাঠালেন না।

দুপুর পার হবার পর গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে রইলেন ঠাকুর। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা গেল। জড়বৎ তাঁর দেহ অবস্থান করতে লাগল দক্ষিণেশ্বরেই।

কিন্তু তিনি? সূক্ষ্ম শরীরে ভক্তের নিদানকালে যে উপনীত হন, তাঁকে মহাযাত্রা করিয়ে দেন, তা জানা গেল তাঁর বাহ্যদশায় ফেরার পরে।

তখন বিকাল প্রায় শেষ। সন্ধ্যা আসন্ন। প্রায় তিন ঘণ্টার পর ঠাকুরের ভাব-ভঙ্গ হল।

তিনি চোখ মেলে হৃদয়কে বললেন, 'মা অম্বিকার অনুচরীরা

এসেছিলেন। মথুরকে তাঁরা রথে দেবীলোকে নিয়ে গেলেন।'

অর্থাৎ সন্ত পরলোকগত মথুরের মৃত্যু সংবাদ ঠাকুর দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে কেউ তখন জানে না একথা। জানা সম্ভবও নয়।

বার্তা শুনে হৃদয় শোকে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কালীঘাটে কয়েকজন কর্মচারী গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। তাঁরা রাত্রে ফিরে এসে জানালেন—মথুরবাবু মারা গেছেন। সন্ধ্যার কিছু আগে।

দিব্যদর্শনে গৌরী

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা। তিনি নিজের 'থাক' মনে করতেন এমন কোটির সাধিকা। গৌরী বা গৌরদাসী বা গৌরী মা নিতান্ত বালিকা বয়স, রূপের জন্যে 'গৌরী' মেয়ে। তারপর প্রথম যৌবনেই যখন দিব্য অনুভবের সূচনা তখন থেকে নিজেকে বলতেন 'গৌরের দাসী।' তাই থেকে 'গৌরদাসী' নাম হয়ে যায়। ঠাকুরও ডাকতেন ওই বলে। তারপর 'গৌরী মা' বলতেন ভক্তেরা। আর বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের শিষ্যরাও ওই সম্বোধন করতেন। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার সময় ঠাকুর নামকরণ করেন—'গৌরী আনন্দ।' তাই পূর্ব আশ্রমের মতন তাঁর পূর্ব নামও কেউ মনে রাখেনি।

ঠাকুরের প্রথমা শিষ্যা তিনি। এমন কি, একমাত্র শিষ্যাও, যতদূর জানা যায়। আর কাউকে কি ঠাকুর এমন দীক্ষিতা করেন নিজের হাতে সন্ন্যাসের বস্ত্র দিয়ে? আর তাঁর চিহ্নিত শিষ্যদেরও আগে পাওয়া গৌরীর দীক্ষা।

আবার কোন কোন প্রিয় শিষ্যের মতন ঠাকুরের আদেশ বাণীও ছিল গৌরীর প্রতি। আর তার সুফলও ফলে।

এমনি নানা কারণে গৌরী মার বড় গৌরবের স্থান রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে।

তাঁর প্রথম গুরুদর্শন—সেই বাল্যকালে—এক আশ্চর্য কথা। আবার নতুন করে যখন গুরু পেলেন, সে ত পরমাশ্চর্য! যেমন বিচিত্র তেমনি দৈবী গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক! কিভাবে গৌরী এলেন দক্ষিণেশ্বরে! ঠাকুরেরও তখন সে কি বিভূতি! এমন ক্বচিৎ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর।

গৌরী মা কি ধরনের সাধিকা, কি তীব্র তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংসার-সুখ, কেমন তুচ্ছ জ্ঞান করেন বালিকা বয়সেই, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে নিজেকে কেমন উৎসর্গ করা—তার কিছু বিবরণ পরে থাকবে। তবে তাঁর পরিচয় আছে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথায়—'গৌরদাসী মহা তপস্বিনী।'

এমন গুরুর কৃপায় পূর্ণ হয়ে ওঠে সাধিকার জীবন।

অথচ দক্ষিণেশ্বরে তিনি আসতে চাননি, ঠাকুরের কথা শুনেও। একবার নয়, হু'বার!

সেবার পুরুষোত্তম তীর্থে গেছেন। তখনই প্রথম শোনেন পরমহংস-দেবের নাম। এক বৃদ্ধ ভক্ত তাঁকে বলেন, 'মাগো, দক্ষিণেশ্বরে এক অসাধারণ পুরুষ দেখে এলুম। তাঁর ঘন ঘন সমাধি হয়।'

কিন্তু গৌরদাসীর মনেই ধরল না সেকথা। আর জানতেও চাইলেন না তাঁর বিষয়ে, সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ত দূরের কথা। অথচ তার কত বছর আগে থেকে নিরন্তর সাধুসঙ্গ করেছেন, কত তীর্থদর্শনে গেছেন কি ক্লেশ স্বীকার করে!

কিন্তু এ তীর্থ-যোগ তখন হল না।

সেবার পুরী থেকে এলেন কলকাতায়। বলরাম বসুর বাড়িতে রইলেন। আর বলরামদের সঙ্গে গৌরীর পারিবারিক জানাশোনা, অনেকদিন থেকে। বলরামের পিতা তাঁরও পিতৃতুল্য। তাঁদের বৃন্দাবনের কালাকুঞ্জে গৌরদাসী তীর্থবাস করেছেন ক'বার। তাঁর অগ্রজ অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলরামের বাল্যবন্ধু। এইসব সূত্রে গৌরী বলরামদের কলিকাতা ভবনেও অতিথি হন। বাগবাজার রামকান্ত বসু স্ট্রীটের সেই গৃহ। যা ঠাকুরের পদার্পণে 'মন্দির' হয়ে ওঠে। যা পরে তাঁর সব চিহ্নিত শিষ্যদের আতিথ্য দিয়ে ধন্য।

বলরাম তার আগে থেকেই যাতায়াত করছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর মাহাত্ম্য বুঝেছেন। অন্তরের টানেও আকৃষ্ট। এক প্রিয় ভক্ত হয়েছেন ঠাকুরের। এমন সময় গৌরী এলেন তাঁদের বাড়িতে।

বলরামও তাঁকে বললেন, 'দিদি, একবার দক্ষিণেশ্বরে চল। সেখানে এক আশ্চর্য সাধু আছেন।'

একে ভক্ত মানুষ। আবার অগ্রজের মতন মাননীয়। তবু সাড়া জাগল না গৌরদাসীর মনে। তিনি হেসে জানালেন, 'জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে দাদা। আর সাধুদর্শনের সাধ আমার নেই।' শুধু তাই নয়। উল্টে বলে দিলেন, 'তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যাক।' অতি শান্ত স্বভাব বলরামের। তিনি আর কোন কথা বললেন না। তখনকার মতন ছেদ পড়ল ও প্রসঙ্গে। কি সে টান যে কিভাবে আসতে পারে তা গৌরীর স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

সেই গৌরী মা! স্বামীজী শিকাগো থেকে পত্র লেখেন যার সম্বন্ধে —তার প্রায় দেড় যুগেরও পরে অবশ্য—'গৌর মা কোথা! এক হাজার গৌর মা দরকার—ঐ noble stirring spirit.'

সেই মহৎ চেতনা'কে স্বামীজী অনেক বছর আগে থেকেই চিনতেন। তাঁর কলকাতা বাসের সময় থেকে। প্রথম জীবনে। গৌরীর মা গিরিবালা ও নরেন্দ্র-জননী ভুবনেশ্বরী-দুজনের মধ্যে ছিল পরিচয়। নরেন্দ্রের চেয়ে বছর ছয়েক বড় গৌরী। দু পরিবারের লোকজনদের আসা যাওয়া হত। স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত পরে স্মৃতিচারণ করেছেন গৌরীমার বিষয়ে; স্বামীজীর কি উচ্চ ধারণা ছিল সাধিকা সম্পর্কে, তাও মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন।

নরেন্দ্র ও গৌরী কাছাকাছি সময়ে আসেন দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। তার প্রায় পাঁচ বছর পরে ঠাকুর দেহ রাখলেন। তারপর আরো বছর আটেক তীর্থভ্রমণ করতে লাগলো গৌরদাসী। উত্তর পশ্চিমে কি নিরলস তীর্থ পরিক্রমা তাঁর তখনো। সেই বালিকা বয়স থেকে যে তীর্থবাসের সূচনা এতদিনে তার সমাপ্তি হল।

এবার জনসমাজে ফিরে আর এক জীবনের উদ্‌বোধন। তাও ঠাকুরের প্রভাবে। তাঁরই প্রেরণা এতদিন পরে মূর্ত হতে থাকে। শিব জ্ঞানে জীব সেবারই অন্য এক রূপ। মাতৃজাতির সেবা। নারী-সমাজের কল্যাণ। মেয়েদের কত কষ্ট। তাদের জন্যে কিছু করতে বলতেন ঠাকুর। গৌরীর মনও নারী-সমবেদনায় সাড়া দিয়ে উঠত। ঠাকুরের আদেশ বীজমন্ত্রের মতন ঝঙ্কার দিত অন্তরে। কিন্তু তখনো তীর্থবাসে ছেদ ঘটাতে পারতেন না।

এবার এল তার ফলনের সময়। সে বাণী আর বীজাকারে মনের কোণে চাপা রইল না। পল্লবিত হতে আরম্ভ হল শাখা-প্রশাখায়।

ঠাকুর সেই যে একটি লক্ষ্য স্থির করে দেন—শুধু নিজের মুক্তি নয়, মানবের মঙ্গল। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মাধ্যমে সে আদর্শ কত রূপ

পায়। তারই এক প্রকাশ ঘটে গৌরীমার জীবনে। তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু হল। তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন মাতৃজাতির সেবায়। ১৮৯৪ সালে, ব্যারাকপুরে শ্রীমা সারদাদেবীর নামে 'সারদেশ্বরী আশ্রম।'

পঁচিশ জন অনাথিনীকে নিয়ে তিনি তার সূত্রপাত করলেন। কুমারী, সধবা ও বিধবা—নানা অবস্থার নারীদের বাস, আহার, শিক্ষা, স্বনির্ভরতার কার্যসূচী নিয়ে। আশ্রমের কাজ শনৈঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কি অসামান্য কর্মনিষ্ঠা, সংগঠন-শক্তি দেখা গেল গৌরীমারা। অধ্যাত্মজীবনের অঙ্গাঙ্গী সেবিকা সত্তা।

এ সবই স্বামীজী দেখেছিলেন। তাই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন—stigging noble spirit.'

সে আশ্রম দেখতে শ্রীমাও গিয়েছিলেন ব্যারাকপুরে। দেখে সন্তুষ্ট হন। আশীর্বাদ করেন গৌরদাসীকে।

তারপর আশ্রমকে তিনি কলকাতায় নিয়ে আসেন (১৯১০)। প্রথমে গোয়াবাগানে। পরে শ্যামবাজার স্ট্রীটে (৯৭৷৩) ভাড়া বাড়িতে। আশ্রম উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে, বহু নারীর সেবায়, কল্যাণে নিযুক্ত থেকে। এক যুগ পরে নিজস্ব ত্রিতল সুদৃশ্য বিরাট ভবনে আশ্রমের সেবা, কর্মকেন্দ্র পূর্ণ রূপ পায়। স্বামীজী অবশ্য এই পরিণতি দেখে যান নি। তবে গৌরীমার কর্ম সূচনাতেই তার ভবিষ্যৎ বুঝেছিলেন দিব্যদৃষ্টিতে। 'সারদেশ্বরী আশ্রম' নিজের গৃহে (মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে) প্রতিষ্ঠা পাবার প্রায় চোদ্দ বছর পর্যন্ত গৌরীমা (দেহান্ত ১৯৩৮, মার্চ ১) তার কর্ণধার থাকেন। বিশ শতকের দু যুগ যাবৎ তাঁর কর্মকেন্দ্র হয় কলকাতা, মাতৃজাতির সেবা ও মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা রূপে। শতধারে প্রসারিত তাঁর সেবাব্রত এখানে।

কলকাতায় এই আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি করতে গৌরীমার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়। শিষ্যাকে যে নারী-কল্যাণের আদেশ বাণী দেন, তখনই বলেছিলেন—'এই টাউনে বসে কাজ করতে হবে।'

'টাউন' অর্থাৎ কলকাতা। এমন এক একটি ইংরেজী শব্দ তিনি মাঝে মাঝে বলতেন (যেমন—ইংলিশম্যান, ডাইলিউট, কুইন, রেফাইন ফ্লোর, স্টিক, বিল্ডিং, অনারারি, বিউটিফুল, থ্যাঙ্ক ইউ, ডেপুটি ইত্যাদি)।

যা হোক, গুরুর কথায় গৌরদাসীর পরিণত জীবন নির্ধারিত হয় কলকাতায়।

সেই গুরুর আবির্ভাব যে তাঁর জীবনে কি অপ্রত্যাশিত ভাবে হয়েছিল! আবার নতুন করে যখন যোগাযোগ ঘটল, সে ত অকল্পনীয়! তার বিবরণ দিতে গেলে আরম্ভ করতে হয় গৌরীর বাল্য থেকেই।

তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৮৫৭ সালে। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে। হাওড়া শিবপুরে পৈত্রিক নিবাস। বাবা পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় খিদিরপুরে একটি সওদাগরী অফিসে কাজ করেন। ধার্মিক ব্যক্তি। মা গিরিবালা আরো ধর্মপরায়ণা। বড় ভক্তিমতী। ভক্তি-ভাবের অনেক গান লেখেন তিনি। আর স্তবও। ঘরোয়াভাবে সুকণ্ঠী গায়িকা গিরিবালা। নিজের রচনা গান যখন শোনান, শ্রোতাদের ভক্তি জাগে। গান আর স্তব রচনার দুখানি বই বেরোয় গিরিবালার—'নামসার' ও 'বৈরাগ্যমালা।' (পরে তিনি ঠাকুরকেও গান শুনিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাঁর গানের সুখ্যাতি করতেন)। মায়ের অধ্যাত্মভাবের উত্তরাধিকারিণী হন গৌরী।

মেয়েটির আসল নাম কিন্তু গৌরী নয়। দুটি নাম ছিল। একটি

অদ্ভুত—যা শোনা যায় না—মৃড়ানী। আর একটি রুদ্রাণী।

অমন নামকরণ কেন হয়েছিল, জানা যায়নি। তবে প্রথম থেকেই মেয়েটির ধর্মের দিকে কি টান। সেই শিশু বয়সেই কালী-ভক্ত। ছেলে-মেয়েদের যেমন খেলায় ঝোঁক, মৃড়ানীর তেমনি নিত্য দেবী-পূজায়। অতটুকু মেয়ে আপন মনে কেবল পূজা। খেলা নয় বা অন্য কিছু নয়। পূজাই যেন খেলা। কখনো কাঁদলে দেবতার নাম শুনিয়েই শান্ত করা যায়।

নিজের সাজসজ্জা বা আরামের দিকেও কোন লক্ষ্য নেই। কোন জিনিসই চায় না নিজে থেকে। অথচ কি কোমল প্রাণ। ভিখিরি দেখলেই কিছু দেবে। কখনো মাটির শালগ্রাম গড়ে একমনে পূজো চলে।

আর বৈরাগ্য একেবারে স্বভাবে। এত বালিকা বয়স থেকে উদাসীন সংসারে, এমন দেখা যায় না।

একদিন নৌকায় যাচ্ছেন দাদার সঙ্গে। হাতে সোনার বালা রয়েছে। নিজের সেই বালার দিকে হঠাৎ নজর পড়ল। নতুন ভাবে মনে মনে বিচার আরম্ভ হয়ে গেল—কেন এই গয়না? এ ত বৃথা। প্রাণে একটা ভার বোধ হল যেন।

এমনি মনে হতেই বালা দু' গাছি নদীতে ফেলে দিলেন, দাদাকে লুকিয়ে। আর গয়না খুলে ফেলতেই মনও হালকা হয়ে গেল।

স্বভাবে আরো এক আশ্চর্য। বাল্য থেকেই নিজেকে মাতৃজ্ঞান করা। মেয়ের ধরণধারণ দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় সবাই। আর বয়স অত কম হলেও শ্রদ্ধাভক্তি করে।

তাঁদের বাড়ির কাছেই এক জ্যোতিষী থাকেন। তিনি মৃড়ানির হাত দেখে বলে দিলেন, 'এ মেয়ে যোগিনী হবে।'

আর তেমনি আশ্চর্য মেয়ের মা'ও। জ্যোতিষীর কথা শুনে তাঁর ভালই লাগে।

সেই জ্যোতিষী অনেক তীর্থে গেছেন। সেই সব গল্প বলতেন তিনি। আর তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে সেসব রুদ্রাণীর মনে গাঁথা হয়ে যায়। তখন থেকেই হয়তো মনে মনে চলে ভবিষ্যতের জল্পনা।

রুদ্রাণীকে কেউ কখনো খেলতে দেখেনি। তার সামনেই অন্য সব ছেলেমেয়েরা খেলায় মত্ত। আর মৃড়ানি চুপ করে বসে। কিংবা চলে সেই ঠাকুর পূজো বা পূজো পূজো খেলা।

একদিন সে এমনি একলা বসে। আর সব ছোটরা খেলা করছে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তিনি মৃড়ানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সবাই খেল্‌ছে, আর তুমি কেন একা বসে আছ ?'

'এসব খেলা আমার ভাল লাগে না।

এই উত্তর শুনে খুশি হলেন তিনি। আশীর্বাদ করে বললেন, 'কৃষ্ণে ভক্তি হোক।'

ব্রাহ্মণ তারপর চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর মূর্তি আর ওই কথাটি একেবারে ছাপা হয়ে রইল রুদ্রাণীর মনে। আর তখন বয়স আর কত। হয়ত বছর আষ্টেক। কিন্তু তাতেই যেন সাধিকা-জীবনের সূত্রপাত হল।

সেই ব্রাহ্মণ কোন প্রচ্ছন্ন সাধক। জাগিয়ে দিয়ে গেলেন অধ্যাত্ম চেতনা।

কে তিনি ?

গৌরী কিছুতেই তাঁকে ভুলতে পারেন না। কেবলই মনে পড়ে তাঁর ওই কথা ক'টি। আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সাধ জাগে। কোথায়

পাওয়া যায় তাঁকে? তাই একমাত্র চিন্তা অতটুকু মেয়ের।

খোঁজা আরম্ভ হল বটে। কিন্তু সন্ধান মেলে না কতদিন। বাড়ির মেয়ের পক্ষে আর কত খোঁজা সম্ভব।

তারপর হঠাৎ একটা সুযোগ আসে। কিংবা সুযোগ করে নেন মৃড়ানি। দাদার সঙ্গে বরানগরে যান একবার। সেখানে দাদার নজর এড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দক্ষিণেশ্বরের কাছে এলেন সেই ব্রাহ্মণের খোঁজে। এ জায়গাটির নাম নিমতে-ঘোলা।

এখানে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন—সেই সাধুর মতন কাউকে কি দেখা যায়?

সন্ধান মিলল শেষ পর্যন্ত। এক চাষী খোঁজ দিলে—ওই কুঁড়েঘরে অমনি সাধুকে দেখতে পাবে।

গৌরী সেই কুঁড়ের মধ্যে এসে দেখেন—সেই ব্রাহ্মণ! তিনি তখন ধ্যানে বসে। চোখ বন্ধ।

একটু পরেই চোখ মেলে চাইলেন।

রুদ্রাণী প্রণাম করতেই তিনি বললেন, 'তুই এসেছিস?'

তাঁকে দেখে আর প্রথম কথা শুনে মনে হল, যেন কতদিনের চেনা। তিনিও কেমন বুঝলেন—এ বালিকার আজন্ম বৈরাগ্য।

এবার সাধু উঠলেন। কুঁড়েঘর থেকে বেরুলেন গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে। পাশের এক বাড়িতে গৌরীর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হল, পরের দিন দীক্ষা দেবেন গঙ্গাস্নানের পরে। দীক্ষিত করার উপযুক্ত আধার, বয়স অল্প হলেও।

সেই মতনই সকালবেলা রুদ্রাণীর দীক্ষা হয়ে গেল। সেখানেই মন্ত্রের নাম জপ করতে লাগলেন গুরুর নির্দেশে। জপ করতে করতে ভাবে

বিভোর হলেন। সে কি অনির্বচনীয় আনন্দ। কতক্ষণ গেল সেইভাবে।

সাধক নিজেও ধ্যানে ছিলেন তখন। তারপর শিষ্যার যখন ভাবের ঘোর কাটল, গুরু হেসে বললেন, 'আবার দেখা হবে—গঙ্গাতীরে।'

ওদিকে আগের দিন থেকে তাঁকে না পেয়ে দাদা খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। এখন পেয়ে গেলেন এখানে। সঙ্গে আরো আত্মীয় ছিলেন।

তখন সেই সাধক তাঁদের বললেন—রুদ্রাণীকে দেখিয়ে—'ও ছেলেমানুষ। ওকে যেন কেউ বোকো না।' আর একটি অদ্ভুত কথা শোনালেন—যা ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল—'হল্‌দে পাখি ধরে রাখা দায়।'

প্রথম দর্শনে তাঁর আশীর্বাদ ছিল—'কৃষ্ণে ভক্তি হোক।' আর এবারে বললেন—'হল্‌দে পাখি।'

ছুটিই দৈব বাণীর মতন ফলে যায়!

সেই অজ্ঞাত-পরিচয় সাধকই গৌরদাসীর জীবনে প্রথম সাধু-সঙ্গ। আর তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি জানতে পারেন অনেক বছর পরে।

দক্ষিণেশ্বরের উপকণ্ঠ থেকে এ যাত্রা গৌরীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হল।

কিন্তু তখন কোন অসুবিধা নেই বাড়ির জীবনে। রুদ্রাণীর দিন চলতে লাগল আপন ভাবে। তাঁর নিজের মতন পূজা আর নাম জপ। আর মা কালীর পট নিয়ে।

কিছুদিন পরের কথা। হঠাৎ বৃন্দাবন থেকে এক সাধিকা এলেন। রয়ে গেলেন গিরিবালার বাড়িতে। বড় ভক্তিমতী সেই ব্রজনারী। তাঁর বড় সাধের বিগ্রহ একটি নারায়ণশিলা। জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে তাই নিয়ে তিনি নিত্য পূজা করেন। মূর্তিটির নাম রাধা-দামোদর। ব্রজরমণী বলেন—দামোদর।

কাউকে তিনি তাঁর বিগ্রহ স্পর্শ করতে দেন না। নিজের কাছে কাছে রাখেন। আর সারাদিন চলে যায় তাঁর সেবা, আরাধনায়।

সেই বৃন্দাবনবাসিনীও এক আশ্চর্য অধ্যায় গৌরীর জীবনে। যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রভাবে বিপুল।

অকস্মাৎ একদিন তিনি ব্রজে ফিরে গেলেন। যেমন এসেছিলেন বিনা ভূমিকায়। কিন্তু যাবার সময় একটি গভীর ছাপ দিলেন গৌরীর জীবনে। কৃষ্ণের ভাবরূপ তাঁর চিত্তপটে মুদ্রিত হয়ে গেল।

এত সাধের সেই রাধা-দামোদর বিগ্রহ তিনি দিয়ে দিলেন গৌরীকে। বললেন, 'বড় জাগ্রত ঠাকুর ইনি।"

যেন তাঁর সেবা যত্ন পূজা ভালভাবে হয়, তাও জানালেন। বলা বাহুল্য। গৌরীর নিজের সাধই যেন পূর্ণ হল। দামোদরকে সেই যে পেলেন, তিনিই হয়ে উঠলেন তাঁর ইষ্ট দেবতা। ঐকান্তিক ভক্তির সঙ্গে পূজো করেন। তেমনি সেবা পরিচর্যা কৃষ্ণ-বিগ্রহের।

এমনি নিত্য উপাসনায় ইচ্ছামতো বেশ দিন চলছিল। কিন্তু জীবনে সঙ্কট ঘনিয়ে এল এবার। গৌরীর বয়স এখন দশ বছর চলেছে। মেয়ের ধর্মাভাব ভাল বটে। কিন্তু, অভিভাবকরা স্থির করলেন, বিয়ে দেওয়া দরকার। আরও দেরি হলে সমাজে নিন্দা রটবে।

সুতরাং বিয়ের সম্বন্ধ আরম্ভ হল। কিন্তু গৌরীর তাতে মত নেই। তা তিনি এইভাবে জানিয়ে দিলেন, 'আমার এমন বর হবে যার মৃত্যু নেই।'

অদ্ভুত কথা। কিন্তু অভিভাবকরা কান দিলেন না তাতে। অনেক বাধার পরে তাঁরা বিবাহ স্থির করলেন একদিন। আর গৌরী এক অসমসাহসিক কার্য করে ফেললেন। বিয়ের দিন পালিয়ে গেলেন বাড়ি

ছেড়ে। এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে রইলেন। তাঁর মায়েরও সহযোগিতা ছিল এ ব্যাপারে।

পরে আবার তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু বিবাহের চেষ্টায় সেখানেই ক্ষান্তি। আর গৌরীও ঘরে বাস করে বৈরাগিনী থেকে যান। অনিকেত জীবনের ডাক অন্তরে সাড়া জাগায় নিয়তই। দূর তীর্থের আহ্বান মাঝে মাঝেই আকুল করে তোলে। মনের দিকে সংসার বন্ধন একেবারেই ছিন্ন। যাত্রা নাস্তি কেবল যোগাযোগের অভাবে।

আরো ক বছর গেল। এবার হল কাছাকাছি তীর্থ। মাসিমা ও কজন আত্মীয়ের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে যেতে পারলেন। তারপর সেখান থেকেই পাড়ি দিলেন সুদূর তীর্থে। সঙ্গী আত্মীয়-স্বজন কেউ সন্ধান পেলেন না। গঙ্গাসাগরেই পশ্চিমের কজন সাধু সন্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁদের কাছেই পথের কিছু নির্দেশ নিয়ে যাত্রা করলেন হিমাচলের উদ্দেশ্যে। বাড়ি থেকে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

এখন বয়স তাঁর আঠার বছর। হলদে পাখির মুক্ত জীবন এবার। এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত তীর্থসাধ মেটাতে আরম্ভ করলেন। গঙ্গাসাগর থেকে সঙ্গে পেয়েছিলেন কয়েকজন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীকে। কিন্তু পরে একাই তীর্থ-পরিক্রমা করতে লাগলেন। আত্মগোপন করতেন পাহাড়ীয়া বেশে। অনেক সময় পুরুষের সাজেও। কখনো ট্রেনে। বেশির ভাগই পদব্রজে। যাত্রা হল হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথে অনেক তীর্থ হল। তিন মাস পরে পৌঁছলেন হরিদ্বারে।

এই তীর্থপথে নারায়ণশিলাকে গৌরী বরাবর সঙ্গে রেখেছেন। কণ্ঠ থেকে বক্ষে ঝোলানো থাকে বিগ্রহ। আর ঝুলিতে কালী ও

গৌরাঙ্গের পট। সেই সঙ্গে চণ্ডী ও গীতা। লোকচক্ষু এড়াতে কেশ কর্তন করেছেন। অঙ্গে কখনো মাখেন ভস্ম, কখনো মাটি। তবু যদি কোথাও নারী সন্দেহ হয়, পাগলিনীর হাবভাব দেখান। পরিধানে গৈরিক বসন। আবার কখনো পুরুষের বেশ ধরতে আল্‌খাল্লায় সাজেন। কথা বলেন না প্রায়স। ভিক্ষার জন্যেও কখনো লোকালয়ে যান না। স্বেচ্ছায় বরণ করা এমনি পরিব্রাজক জীবন।

হরিদ্বারে কিছুদিন যাপন করে, হৃষীকেশে এলেন। বৈরাগ্যের আরো প্রেরণা জাগল হিমাচলের তীর্থবাসে। কঠোর তপশ্চর্যা করতে লাগলেন। যৌবনেই যোগিনী।

কৃচ্ছ্রসাধনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল হৃষিকেশে। তারপর গেলেন কেদারনাথ ও বদ্রীনাথে। সেখান থেকে আরো পশ্চিমে যাত্রা করলেন। তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে কি দুর্জয় সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা। দীর্ঘ, দুর্গম পথ পার হয়ে চললেন একাকিনী। অমরনাথ, জ্বালামুখী এবং আরো তীর্থ পরিক্রম করলেন। যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরীও সাঙ্গ হল এক সময়।

এইভাবে কয়েকবছর চলে গেল। কখনো দেহের পক্ষে অসহ্য হয় এত কৃচ্ছ্রতা। নারী-শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। কখনো অচৈতন্য হন পথশ্রমে, শীতের প্রকোপে। পার্বত্য নারীদের সেবা শুশ্রূষায় কতবার প্রাণ পেয়েছেন। এত বিপত্তির মধ্যেও বিপর্যস্ত হয়নি তাঁর সাধন জীবন। জপ তপ অব্যাহত রেখেছেন।

হিমাচল অঞ্চলে ক'বছর তপস্যার পর গৌরদাসী নেমে এলেন সমতলে। এবার কৃষ্ণলীলাস্থলে ভক্তিসাধন, ভজন। বৃন্দাবন মথুরায় তীর্থের পালা।

পুণ্য ব্রজভূমিতে হয়ত দীর্ঘদিন থাকতেন এ যাত্রায়। কিন্তু সে সাধ

অপূর্ণ রয়ে গেল। এক আত্মীয় তাঁকে দেখে ফেললেন মথুরায়। কলকাতায় সেই সংবাদও পাঠিয়ে দিলেন।

গৌরীও পলায়ন করলেন মথুরা থেকে। একেবারে রাজপুতানায় চলে গেলেন। তীর্থ পরিক্রমা করলেন পুষ্কর প্রমুখ বিভিন্ন অঞ্চলে। তারপর আর এক কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্রে উপনীত হলেন—সৌরাষ্ট্রে। প্রভাস, দ্বারকার মন্দিরে মন্দিরে তীর্থ সমাপন করলেন।

যখন সুদামাপুরীতে রয়েছেন, তখন দেখা গেল রুদ্রাণী চরিত্রের আর এক প্রকাশ। ভক্ত, সাধিকা সত্তার পাশাপাশি তাঁর কল্যাণময়ী সেবিকা রূপ। নিকটেই বিসূচিকা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। শুনে বিচলিত হলেন তিনি। পীড়িতদের মধ্যে সেবা কার্য আরম্ভ করে দিলেন। আর্তের শুশ্রূষা করতে লাগলেন প্রাণ তুচ্ছ করে। যতদিন প্রয়োজন, সেখানে রইলেন।

সুদামাপুরী থেকে আবার এলেন বৃন্দাবনে। এবার সেই আত্মীয় দেখা মাত্র তাঁকে একেবারে গ্রেপ্তার করলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

এত বছর পরে তাঁকে ফিরে পেয়ে মা ও সকলেই আনন্দ করতে লাগলেন। কোন তিরস্কার নয়। যত্ন, আদর খুবই পেলেন। সবাই বুঝলেন তাঁর সন্ন্যাসিনী হওয়ার কথা। ভাগ্যক্রমে কোন অপযশ হল না, যা হতে পারত সেকালের পরিস্থিতিতে। সেই ১৮৮০ সালে।

বাড়িতে আত্মীয় স্বজনদের গৌরী সুদীর্ঘ তীর্থ-ভ্রমণ কথা শোনাতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরেই অতৃপ্তি এল গৃহ-জীবনে। হলদে পাখি ধরে রাখা দায়।

আবার তিনি তীর্থে বেরুলেন। এবার এলেন শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে। এখানে তাঁর মাহাত্ম্য অনেকের লক্ষ্য পড়ে। মন্দিরের পাণ্ডারা মুগ্ধ হন তাঁর নিষ্ঠা, ভক্তি, পাণ্ডিত্য দেখে আর জগন্নাথ দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন।

পুরীতেই গৌরীর পরিচয় হল রাধারমণ বসুর সঙ্গে। পরম ভক্ত বৈষ্ণব তিনি এবং জমিদার। তাঁরই পুত্র বলরাম বসু।

সাধিকার ভক্তি ও বৈরাগ্য দর্শনে রাধারমণ বড়ই প্রীতি লাভ করলেন। তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই তিনি সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাতেন গৌরদাসীকে। কখনো তাঁর বৃন্দাবনের 'কালাকুঞ্জ' আবাসে। কখনো কলকাতার ভবনে—পরবর্তীকালে যা 'বলরাম মন্দির' নামে সুপরিচিত। গৌরী দু-স্থানেই তাঁদের অতিথি হয়েছেন।

আর পুরীতে এক বৃদ্ধ সেই প্রথম শোনান পরহংসদেবের কথা—'তাঁর ঘন ঘন সমাধি হয়।'

তারপর গৌরী এলেন কলকাতায়। বসু মশায়ের বাড়িতেই রয়েছেন। তখন বলরামও বললেন, 'দিদি, একবার দক্ষিণেশ্বরে চল। সেখানে এক আশ্চর্য সাধু আছেন।'

আর গৌরীর সেই উত্তর—'তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান—তার আগে যাচ্ছিনে।'

বলরাম আর কিছু বললেন না।

সাধিকার বয়স এখন ছাব্বিশ বছর। তিনি পূজা জপ তপ নিয়ে আছেন সেখানেই। ঠাকুরঘরে দামোদরের যথাবিধি অর্চনা করেন। পটের গৌরাঙ্গও তাঁর প্রিয় আরাধ্য।

বলরামের সঙ্গে ওই প্রসঙ্গের কদিন পরের কথা।

দামোদরের পূজায় গৌরী এসেছেন ঠাকুরঘরে। বিগ্রহের অভিষেক করেছেন। তারপর দামোদরকে সিংহাসনে রাখতে গিয়ে দেখলেন সেই অকল্পনীয় দৃশ্য! দুটি জীবন্ত চরণ সিংহাসনে স্থাপিত!

সম্পূর্ণ দেহধারী কেউ নেই। শরীরের অন্য অঙ্গও দৃশ্যমান নয়। শুধু দুটি পা রয়েছে সিংহাসন জুড়ে।

স্বচক্ষে দেখেও মনে হল, চোখের ভ্রম। তাই আবার লক্ষ্য করলেন। কয়েকবার দেখলেন। না, বিভ্রান্তি নয়। কেবল দুটি পদ রয়েছে সিংহাসনে। দেখে, হতবুদ্ধি গৌরী। কি করে পূজা হবে?

ইষ্টদেবতাকে রাখবেন কোথায়? কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কিছু চিন্তা করা যাচ্ছে না। তবু কোনরকমে দামোদরকেই তুলসী দিলেন। কিন্তু সে তুলসী গিয়ে পড়ল ওই দুটি পায়ে। স্পষ্ট, চোখের সামনেই!

এবার গৌরী জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অচৈতন্য হয়ে পড়লেন সিংহাসনের পাশে।

পূজার ঘরে অনেকক্ষণ গেছেন যে! বলরাম-পত্নী এবার গৌরীকে দেখতে এলেন। ডাকে কোন সাড়া না পেয়ে, ভেতরে ঢুকলেন দরজা ঠেলে। দেখলেন—ভূলুণ্ঠিতা, জ্ঞানহারা।

প্রায় তিন ঘণ্টা শুশ্রূষার পর চৈতন্য হল গৌরীর। কিন্তু তখনো মুখে কথা ফুটল না। নিজের কেবল বোধ হতে লাগল, কে যেন বুকের মধ্যে টানছে সুতো দিয়ে। নিরন্তর সেই টান। আর বুকের মধ্যে এমন বেদনা হচ্ছে যা ব্যক্ত করা যায় না। অদ্ভুত এক যন্ত্রণা।

সারা দিন এবং রাতও তেমনি ঘোর অবস্থায় কাটল। কোন কথা বললেন না কারুর সঙ্গে। শেষ রাতে ঘর থেকে বেরুলেন। সদর দেউড়ির কাছে এলেন বাইরে যাবার জন্যে।

দরোয়ান আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবেন ?'

গৌরী নিরুত্তর। দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন বলরাম এসে পড়লেন সেখানে। স্ত্রীর কাছে গৌরীর বিবরণ তিনি শুনেছেন। এখন জিজ্ঞেস করলেন, 'দিদি দক্ষিণেশ্বরে মহাপুরুষের কাছে যাবে ?'

গৌরী মৌন মুখে তাঁর দিকে চাইলেন।

বলরাম আর বিলম্ব করলেন না। গাড়ি আনালেন। গৌরীকে পত্নীর সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

তখন প্রত্যূষ। মন্দির পার হয়ে ঠাকুরের ঘরে এলেন। দেখলেন তিনি সুতো জড়াচ্ছেন কাঠিতে, আপন মনে। আর গান গাইছেন—যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি, সে রূপ লুকালি কোথা করাল-বদনি।...

গায়কের দিকে চেয়েই গৌরী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—একি! তাঁরই পা ছুটি—কাল দেখেছিলেন সিংহাসনে!

আর ঠাকুর তাঁদের দেখে সুতো জড়নো বন্ধ করলেন। কাঠিটি রেখে দিলেন একপাশে।

অমনি গৌরীর সেই অব্যক্ত ব্যথা দূর হয়ে গেল, যেন জাদুমন্ত্রে। হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ জাগল। কি অপূর্ব শান্তি। আর কোন টান নেই বুকে।

সকলের সঙ্গে গৌরীও তাঁকে প্রণাম করলেন। আবার শিহরিতা হলেন চরণ ছুটি দেখে। অবিকল সেই সিংহাসনে দেখা।

ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখেন, ঈষৎ হাসি-মুখ।

আর এক বিস্ময় জাগল গৌরীর মনে— কোথা যেন দেখেছি এঁকে ?

কে ইনি? বিশেষ চেনা মনে হয়। কিন্তু স্মরণে আসছে না ত। না জানলেও স্বস্তি নেই। চিন্তাকুল হয়ে রইলেন।

ওদিকে ঠাকুর প্রশ্ন করলেন বলরামকে, গৌরীর দিকে চেয়ে—'ও বলরাম, এটি কে?'

'আমার ভগ্নী।'

ঠাকুরের যেন বিশ্বাস হল না। 'তোমার আপন ভগ্নী?'

একটু ইতস্তত করে বলরাম বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, বুঝলেন ঠাকুর। রঙ্গচ্ছলেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'এ্যাঁ, কায়েত! উঁ হুঃ।'

বলরাম এবার হেসে জানালেন, 'আজ্ঞে ইনি ব্রাহ্মণ। আমার এক বন্ধুর ভগ্নী। আমার পিতাকে পিতা বলে।'

সহাস্যে ঠাকুর মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই বল, এ যে এখানকার থাকের লোক। অনেক কালের চেনা।

এতক্ষণে গৌরীর চিত্তপটে ফুটে উঠলো—সংশয়ের উত্তর! মহাপুরুষের রহস্য উন্মোচিত হল।

মনে পড়ল, বহু বছর আগেকার সেই সাধককে। যিনি প্রথমে বলেন, 'কৃষ্ণে ভক্তি হোক।' তার পর যাঁর সাক্ষাৎ পান নিমতে ঘোলায়, নির্জন কুটিরে। পরের দিন সকালে দীক্ষা দেন। দাদাদের বলেছিলেন, 'ও ছেলেমানুষ। ওকে যেন কেউ বোকো না। হলদে পাখি ধরে রাখা দায়।' আর তাকেই শেষে জানান—'আবার দেখা হবে,—গঙ্গাতীরে।'

সমস্তই মনে পড়ে গেল গৌরীর। সেই মহাপুরুষ এতদিন পরে দেখা দিলেন এই গঙ্গার ধারে।

সেদিন বিদায় নেবার সময় ঠাকুর বললেন, 'আবার এস মা।'

পরের দিনই গৌরী এলেন। গঙ্গাস্নান করে। বুকে দামোদর বিগ্রহ শিলা। ঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

দেখে তিনি বললেন, 'তোর কথাই ভাবছিলুম।'

গৌরী ভক্তিভরে নিজের জীবনের কথা বললেন। সিংহাসনে শ্রীচরণ দেখার কথাও।

শেষে ভাবের কথা জানালেন, 'ও বাবা, তুমি যে এখানে লুকিয়েছিলে, আগে ত তা বুঝতে পারিনি।'

ঠাকুর সহাস্যে সঙ্কেত দিলেন, 'তাহলে সাধন ভজন কি করে হত?'

তারপর গৌরদাসীকে নিয়ে গেলেন নহবতের ঘরে। শ্রীমার কাছে এসে, শিষ্যাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওগো ব্রহ্মময়ী, এক সঙ্গিনী চেয়েছিলে—এই নাও সঙ্গিনী এল।'

হৃদয়রামের সৌভাগ্য

শ্রীরামকৃষ্ণের কত ঘনিষ্ঠ সেবক আর আত্মীয় হৃদয়। তাও কি কম সুকৃতি? এত নিকটে থাকার ভাগ্যেই ঠাকুরের কিছু যোগ বিভূতি দেখেন তিনি। আর তাঁর নিজেরও কিছু মিলে ছিল।

বছরের পর বছর ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সঙ্গ পান। সেবা পরিচর্যা করেন দিনরাত্রি। তাঁর সেই যুগ-ব্যাপী কঠোর সাধন পর্বে হৃদয়রাম ত অচ্ছেদ্য, দৈনন্দিন প্রয়োজনে। ঠাকুরের কত যত্ন তিনি নেন। কত শুশ্রূষা যে করেন সময়ে অসময়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে। তার কি কোন সুফল থাকবে না? সুদীর্ঘ তেইশ বছর হৃদয় তাঁর সেবা করেছিলেন।

তা ছাড়া সম্পর্কও বেশি দূরের নয়। হৃদয়ের মা ঠাকুরের পিসতুত ভগ্নী। প্রায় সমবয়সী দুজনে। হৃদয় দু বছরের ছোট। আর ছেলেবেলা থেকেই মাতুলের সঙ্গী থাকেন, বন্ধুর মতন। ভাগিনেয়র স্বগ্রাম শিওড় কামারপুকুরের কাছেই। ঠাকুর আবাল্য কতবার গেছেন শিওড়ে। দুজনে একসঙ্গে সেখানে থেকেছেন। আবার হৃদয়ও কত এসেছেন কামার-পুকুরে।

পরে যৌবনকালেও দুজনের ঘনিষ্ঠতা বরং বেড়েছে। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে ঠাকুর বাস করতে এসেছেন সেখানে। নিজে বিগ্রহের বেশকার হয়েছেন। আবার নিযুক্ত করিয়েছেন হৃদয়কে। তখন থেকে ভাগিনাও দক্ষিণেশ্বর নিবাসী, নিত্য সঙ্গী। তারপর ঠাকুরের তপশ্চর্যা চলেছে বছরের পর বছর এখানেই। হৃদয়ও সেসময় অতন্দ্র সেবক। কখনো দুর্ব্যবহারও করে ফেলেছেন বটে। ঠাকুরও সেজন্যে কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু তিনিও জানিয়েছেন যে, হৃদয়ের যত্ন পরিচর্যাও যথেষ্ট।

ঠাকুরের জীবনকথায় তাই তাঁরও প্রসঙ্গ অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। আর তাঁর স্মৃতিও অমরত্ব পেয়েছে ঠাকুরের প্রতিকৃতিটির সঙ্গে। কেশবচন্দ্রের কমলকুটিরে ঠাকুরের সেই সমাধিস্থ অবস্থার ছবিটিতে। তাঁর দণ্ডায়মান দেহ ধারণ করে রয়েছেন হৃদয়। তাঁর আদরের 'হৃদু'। হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। সুঠাম স্বাস্থ্যবান শরীর।

মাতুল যে তাঁকে স্নেহ করেন এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। আর এই আধ্যাত্মিক পরিবেশে আকাঙ্ক্ষাও জাগে হৃদয়ের। অর্থাৎ দৈবীশক্তি লাভের ইচ্ছা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিত্য এত ভক্তের আসা যাওয়া। মুক্তির দিশা পাচ্ছেন এত লোক! কতদিন এসব ত হৃদয়ের সামনে বসে দেখা। তাই তিনি ভেবেছিলেন—ঠাকুর এমন

নিকট আত্মীয়, তাঁকে অধ্যাত্ম সম্পদ দেবেন প্রার্থনা জানালে।

একদিন সত্যই তাঁর অর্ধ বাহ্য-দশা হয়েছিল। কালীপূজায় বসেছিলেন তখন ; ঠাকুরের প্রসাদে দর্শন অনুভূতির ভাব জেগেছিল।

আর এক সৌভাগ্যও হয় তাঁর। ঠাকুরের যোগ বিভূতির সাক্ষাৎ পরিচয় তিনি পান। একাধিক বার এত বছরের সঙ্গলাভ। এদিকের কথা কিছু না জানাই ত অস্বাভাবিক।

সে প্রসঙ্গে বিশেষ করে বলবার হল হৃদয়ের দুর্গোৎসবের কথা। তা ছাড়াও আরো কিছু জানানো যায়। সে দুর্গাপূজার আগেও প্রকাশ পায় ঠাকুরের দৈবীশক্তি। আর হৃদয় সে ঘটনার দর্শক।

প্রথমে, তাঁর সেই রাত্রির অভিজ্ঞতা। তার ঘটনাস্থল দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চত্বর থেকে উত্তর দিকে। রাত তখনো গভীর হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেরিয়েছেন নিজের কক্ষ থেকে। পঞ্চবটির দিকে চলেছেন। নিত্য সেবকও আছেন পিছনে। তাঁর হাতে গাড়ু ও গামছা, যদি ঠাকুরের প্রয়োজন হয়। তবে ঠাকুর যাচ্ছেন তাঁর ধ্যানের আসনের দিকে, পঞ্চবটীর নীচে।

এগিয়ে চলেছেন ঠাকুর। তাঁর দিকে চেয়েই পিছনে হৃদয় আসছিলেন। হঠাৎ দেখেন—এক দিব্য দৃশ্য চোখের সামনে। মাতুলের মতনই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু দৈনন্দিন দেখা তাঁর স্থূল শরীর কোথায়! সম্মুখের মূর্তি অবশ্য চলমান। কিন্তু অস্থি মাংসের বাহ্যদেহ তা নয়।

হৃদয় স্পষ্ট দেখলেন—এ এক জ্যোতির্ময় কায়া যাচ্ছেন তাঁর আগে আগে। আর সেই অঙ্গ থেকে চতুর্দিকে রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে। দিবালোকের মতন দৃশ্যমান—সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ অবয়ব অগ্রসর হচ্ছেন শূন্যপথে। তাঁর পা দু'টি মাটি স্পর্শ করছে না।

হৃদয় ভাবলেন—এও কি সম্ভব ? সবই তাঁর চোখের বিভ্রম। তিনি চক্ষু মার্জনা করে নিলেন। আবার লক্ষ্য করলেন ভাল করে। কিন্তু একই দৃশ্য দেখলেন—মাতুলের স্থূল শরীর নয়, জ্যোতিষ্মান তনু। বার বার দেখতে লাগলেন সেই অলৌকিক রূপ ঠাকুরের।

আরো এক অদ্ভুত ব্যাপার। হৃদয়ের নিজের দেহে এবার চোখ পড়ল। কিন্তু একি ! এতদিনের পরিচিত দর্শনধারী ত নয়। এও দ্যুতিময় কায়া। কোন দেব-অনুচর বুঝি দিব্য রূপ নিয়েছেন তাঁরই অঙ্গে। দেব-সেবার জন্যে দেবেরই অংশে জন্ম হয়েছে। এই তাহলে তাঁর আপন জ্যোতির্ময় স্বরূপ ! নিজেকেই যেন এবার জানা হল।

হৃদয়ের আনন্দের সীমা রইল না আত্মজ্ঞান লাভ করে। মনে অপূর্ব পুলকের উচ্ছ্বাস জাগল। তিনি বাহ্য-জগৎ সংসার সব কিছু ভুলে গেলেন। মত্ত হয়ে উঠলেন অনির্বচনীয় ভাবের আবেশে।

এ যেন অন্য হৃদয়রাম। কোন নবজাতক।

এবার তিনি ঠাকুরের নাম ধরে ডাক দিলেন। বললেন, 'চল, চল। আমরা আর স্থূল-শরীর নই। আমাদের দিব্য তনু। চল, এবার দেশে গিয়ে জীবের উদ্ধার করি।'

কিন্তু এসব কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'হৃদু, চুপ কর্। কি হয়েছে যে এমন করছিস্ ? এমন শুনলে লোকে ছুটে আসবে। সে এক মহা হাঙ্গামা হবে।'

হৃদয়ের তখনও আত্মহারা আবিষ্ট অবস্থা। তিনি ভাবের ঘোরে মাতুলকে বলে উঠলেন, 'তুমি যেমন রামকৃষ্ণ, আমিও তেমনি।'

ঠাকুর আর মুখে কিছু বললেন না। পরণের কাপড় ভাল করে বাঁধলেন কোমরে। হৃদয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর বুক

স্পর্শ করলেন নিজের হাতে। খানিকক্ষণ বুকে হাত বুলিয়ে, সতেজে বললেন, 'থাক্ শালা জড় হয়ে।'

তখনি হৃদয় আগেকার অবস্থায় ফিরে এলেন। আর কেঁদে উঠে করুণ স্বরে বললেন ঠাকুরকে, 'কেন মামা আমায় জড় করে দিলে? আমি এতক্ষণ বেশ ছিলুম। আমার সেই ভাব আবার ফিরিয়ে দাও।'

ঠাকুর অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে শান্ত করলেন। বুঝিয়ে বললেন, 'সময়ে সব হবে। এখন থাক। এখনো সময় আসেনি। এখন ক্ষান্ত হ।'

হৃদয়কে ক্ষান্ত হতেই হল। তাঁর নিজের শক্তিতেও কিছু হয়নি। যাঁর বিভূতিতে হয়েছিল তিনিই নিবৃত্ত করলেন।

কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না হৃদয়। কি অপূর্ব ভাবের মধ্যে এতক্ষণ ছিলেন। সেই দিব্য আনন্দ হারিয়ে গেল একেবারে।

মন তাঁর বড়ই ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ হয়ে রইল। সেই পুলকের অভাব বোধ হতে লাগল সর্বক্ষণ। মনে আর সুখ নেই। স্ফূর্তি নেই। মুখ গম্ভীর। মাতুলের ওপর অভিমানও হল তেমনি। অত উন্নত অবস্থা থেকে মামা টেনে নীচে নামিয়ে আনলেন!

সেই ভাব পুনরায় পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তারপর ভাবলেন এবার নিজে সাধন করব। তেমনি অবস্থার আবার উঠব। নিজের শক্তিতে সেই আনন্দ ফিরিয়ে আনব। মামার মতন আমিও তপস্যা করব। এই পঞ্চবটিতে।

ঠাকুরের সাধনার আসন ত তাঁর জানা ছিল। পঞ্চবটের মূলে বসে কি কঠোর তপস্যা করেছিলেন তিনি। হৃদয় ভাল করেই দেখেছিলেন। সেই মাতুলের সিদ্ধিলাভের স্থান!

তিনি এবার স্থির করলেন, সেই চৈতন্যময় সিদ্ধভূমিতেই সাধন

ভজনে প্রবৃত্ত হবেন। তাঁরও সিদ্ধি আসবে স্থান মাহাত্ম্যে!

কিন্তু হৃদয়ের ধারণা ছিল না সেই পীঠস্থানের মহিমা। পঞ্চবটির সিদ্ধভূমি। তারই উপরে এক ভৈরবের অবস্থান। তিনি রক্ষা করেন ঠাকুরের পীঠ। অন্য কোন সাধক যেন সেখানে অনাধিকার প্রবেশ না করেন—ভৈরব তাই প্রহরায় থাকেন। কাউকে সেখানে পেলেই তিনি অতিষ্ঠ করে তোলেন। ভয়ানক তাঁর তেজ।

অজ্ঞ হৃদয় সেখানেই এলেন সাধনা করতে। ঠাকুরকেও কিছু জানান নি। একা এলেন গভীর রাত্রে। আসন স্থির করে ধ্যানে বসলেন।

কিন্তু ধ্যান ভগ্ন হল অচিরেই। সর্বাঙ্গে এ কি দারুণ জ্বালা। মনোনিবেশ করবেন কি! যন্ত্রনায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন। মাতুলকে ডাকতে লাগলেন কাতর কণ্ঠে—'ও মামা, বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে। আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে।'

সেই চীৎকার শুনে ঠাকুর এসে পড়লেন তাড়াতাড়ি। তাঁকে দেখেই হৃদয় বলে উঠলেন, 'আমার গা হাত পুড়ে গেল। আমায় বাঁচাও।'

আর জানালেন, 'আমি চোখ বুজে ধ্যান আরম্ভ করেছিলুম। কিন্তু কে যে এখানে লুকিয়েছিল, কে জানে। সে আমার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমি জ্বলেপুড়ে মরছি। তুমি আমায় বাঁচাও মামা।'

ঠাকুর বুঝলেন সবই। তিনি হৃদয়ের বুকে হাতে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। হৃদয় এবার আরাম বোধ করলেন। অঙ্গ শীতল হল। দূর হয়ে গেল সব জ্বালা যন্ত্রণা।

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'তোমাকে বারণ করেছিলুম। কিন্তু তুমি আমার কথা শোননি। মিছিমিছি এই যন্ত্রণা ভোগ করলে।

নিজেই নিজের কষ্ট ডেকে আনলে। শোন হৃদু, তোমার আর আলাদা সাধনের দরকার কি ? তুমি ত আমাকে সর্বদা পাচ্ছ। আমায় সেবা কর, তাহলেই সব হবে।'

যাঁকে পাবার জন্যে মানুষ সাধন ভজন করে, তিনি স্বয়ং যদি সামনে বিরাজ করেন, তা হলে আর কেন সাধনা ? কিন্তু লোকে ত অবতারকে চেনে না, বুঝতে পারেনা তাঁর মহিমা।

হৃদয়ও তাই নিত্য সঙ্গ পেয়েও মায়া ঘোরে আচ্ছন্ন। সেই রাত্রে ত ঠাকুরের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছিলেন। এমনকি স্বচক্ষেও দেখেন অলৌকিকী। কিন্তু পুনরায় ভুলে যান ঠাকুরের স্বরূপকে, মায়ার প্রভাবে।

এখন আবার ধারণা হল, কতখানি ঠাকুরের দিব্যশক্তি। মনে মনে বললেন, 'তিনি যা বলেন সেই মত করব।'

এই স্থির করে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মনের দুঃখ রয়েই গেল। আর ত পাবেন না সেই অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ।

দিন চলে যায়। তারপর এসেছে শরৎকাল। বাংলার আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর ধ্বনিত হচ্ছে। জানা গেছে, এবার অম্বিকা পূজার লগ্ন আশ্বিন মাসে। হৃদয়ের মনে বড় সাধ হল, শিওড়ের বাড়িতে পূজা করবেন। মাতুলকেও জানালেন সে ইচ্ছার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সায় দিলেন। তাই হৃদয়ও মনে করলেন, ঠাকুর নিশ্চয়ই যাবেন তাঁর সঙ্গে। দেশের পূজায় উপস্থিত থাকবেন। যখন সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁকে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

একথা মথুরবাবুর কানে গেল। শুনে তিনি বললেন, 'তা হবেনা। এখানেও ত মহাপূজা। বাবাকে এখানে থাকতেই হবে। আমি তাঁকে

পূজার সময় ছাড়ছি না।'

হৃদয় বড় নিরুৎসাহ হলেন। ঠাকুর যদি না যেতে পারেন, পূজার আনন্দ অনেকখানিই চলে যাবে। অম্বিকা পূজা যেন অসম্পূর্ণ থাকবে তাঁর অভাবে।

তাঁর মনোকষ্ট বুঝে মথুরবাবু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বললেন, 'হৃদয়ের পূজায় যে খরচ হবে, দেব। কিন্তু বাবাকে আমি যেতে দিতে পারব না। তিনি আমাদের পূজায় থাকবেন। হৃদয় যেন মনে কষ্ট না করে।'

হৃদয়ের মন কি তাতে সায় দিতে পারে? কিন্তু নিরুপায়। সর্বময় কর্তা মথুরবাবু। তাঁর ওপরে কোন কথাই চলে না। হৃদয় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই রইলেন।

ঠাকুর অবশ্য বুঝলেন তাঁর ব্যথা। আর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হৃদু, তুই দুঃখ করিসনি। আমি প্রত্যহ তোর পূজো দেখতে যাব। পূজোর তিন দিন আমি কিছুক্ষণের জন্যে তোর পূজোর স্থানে থাকব। আমি সূক্ষ্ম দেহে যাব। আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। শুধু তুই দেখবি।'

তারপর পূজায় হৃদয়ের কি করণীয় সব জানালেন। উপাসনার পর দুপুরে গঙ্গাজলের সঙ্গে মিছরির পানা পান করবার কথাও বললেন।

শিওড়ে গেলেন হৃদয়। মাতুলের কথা অনুসারে বিধিমত পূজার সব করলেন।

সপ্তমী পূজার শেষ রাতেই দেখলেন—দিব্য দৃশ্য! প্রতিমার পাশে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন, ভাবের আবেশে। তাঁর শরীর জ্যোতির্ময়।

শুধু সপ্তমীর রাতে নয়। মহাষ্টমী এবং নবমী পূজার পরেও। পর পর তিন রাত্রি তাঁর আবির্ভাব হৃদয় স্বচক্ষে দেখলেন, শিওড়ে তাঁর

গৃহে। অন্য কেউ তাঁকে দেখতে পেলেন না। হৃদয়ও কাউকে জানালেন না এবিষয়ে।

পূজা অনুষ্ঠানের শেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন।

এখানে দেখা হল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। ঠাকুর বরাবর এখানেই রয়েছেন!

পণ্ডিতের চৈতন্য লাভ

তখনকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ। নানা শাস্ত্র, বিশেষ ন্যায় ও ব্যাকরণে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। এজন্যে তিনি স্বীকৃতিও পান বিদ্বৎসমাজে। আর বিদ্যার অহমিকাও ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বিলক্ষণ ছিল।

হুগলী জেলার আঁটপুরে তাঁর বাস। সেই যে আঁটপুর পরে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম চিহ্নিত শিষ্য প্রেমানন্দের (বাবুরাম) জন্যে। বাবুরামের আঁটপুর বাড়িতেই নরেন্দ্র প্রমুখ ঠাকুরের এগার জন শিষ্য বিরজা হোম করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। ঠাকুর ও শ্যামপদ প্রসঙ্গের কিছু পরের সেকথা।

ন্যায়বাগীশের সঙ্গে ঠাকুরের যোগাযোগ ঘটে, শরৎ (সারদানন্দ) শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) আসার পরে। পরমংসদেবের নাম যশ শুনে পণ্ডিত মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎ করতে আসেন।

আঁটপুর থেকে বাংলার অনেক দূর দূরান্তে ছড়িয়োছল তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। শাস্ত্রের বিধান দেবার জন্যে নানা স্থান থেকে তিনি ডাক পেতেন। ধনী গৃহে বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তাঁর

আমন্ত্রণ আসত। যথেষ্ট উপার্জনও হত তাঁর এমনি যজন কাজে।

প্রায় পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চায় ব্যস্ত থাকেন। ধর্মের গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করেননি। কিংবা আকৃষ্ট হয়নি অধ্যাত্ম সম্পদের দিকে। কখনো সে অভাব বোধও তাঁর হয়নি। আত্ম-সন্তুষ্ট ছিলেন শুষ্ক পণ্ডিত্যের পরিধিতে। শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কারে অভিমানে পূর্ণ।

এমন সময় উত্তরপাড়া থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এল। তাঁর আহ্বানকারী হলেন বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। যেমন ধনী জয়কৃষ্ণ, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠাবান। আবার বিদ্যোৎসাহী, দেশের নানা কল্যাণকর্মে পৃষ্ঠপোষক তাঁর সংগৃহীত বিশাল গ্রন্থাগার পরে তাঁরই স্মৃতিতে সাধারণের পাঠাগার রূপে দেখা দেয় উত্তরপাড়ায়।

ন্যায়বাগীশের যত প্রতিপত্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁদের অন্যতম জয়কৃষ্ণ। সেদিন পণ্ডিত মহাশয়কে তিনি পারিবারিক কোন ক্রিয়া উপলক্ষে আনিয়েছিলেন।

অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ পরে দুজনের আবার দেখা হল জয়কৃষ্ণের বৈঠকখানায়।

ন্যায়বাগীশ প্রবেশ করে দেখলেন, গৃহপতি গ্রন্থপাঠ করছেন।

জয়কৃষ্ণের হাতে যে বইখানি ছিল, তার নাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'। খুবই প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় পুস্তকটি। বিরাট আকার সত্ত্বেও পরে পরে তার বহু মুদ্রণ হয়। সম্ভবত এগার সংস্করণ, যা সেকালের বাংলা গ্রন্থজগতে দুর্লভ কীর্তি। বইখানি রচনার পারিপাট্যেও উল্লেখনীয়। বিশেষ কথ্যভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে এক দৃষ্টান্ত রাখে সেযুগে।

'এই এক নূতন বা হরিদাসের গুপ্তকথা'-র রচয়িতা নিয়েও একটু

কথা আছে। 'শোভাবাজার রাজবাড়ির' কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব তার লেখক বলে মুদ্রিত বটে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ মহলে কথিত আছে যে 'গুপ্ত কথা'র প্রকৃত রচয়িতা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থকার হিসাবে উক্ত ভুবনচন্দ্রের নাম যশ সেকালে ছিল। তাঁর জীবনী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় আর বেশ শক্তিশালী লেখকও তিনি। কিন্তু সাহিত্য রচনা সে যুগে অর্থকারী ছিল না। তিনিও ছিলেন অন্য উপায়হীন। দরিদ্র লেখক ভুবনচন্দ্র তাই বিক্রয় করতেন স্বরচিত একেকটি গ্রন্থের নাম-সত্ব। কোন পৃষ্ঠপোষকই তা কিনে রাখতেন। আর তা প্রকাশিত হত শেষোক্তের নামে। উপেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন ভুবনচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক। শোভাবাজার দেব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের প্রপৌত্র তিনি। উপেন্দ্রকৃষ্ণের পৌত্র হলেন হারীতকৃষ্ণ দেব, প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র উৎকৃষ্ট চলিতভাষা ব্যবহারের বিশেষ সুখ্যাতি চৌধুরী মহাশয় করতেন। হারীতকৃষ্ণ এই 'গুপ্তকথা'র গুণ বিষয়ে প্রথম শোনেন প্রমথ চৌধুরীর কাছেই। পাকা হাতের রচনা 'গুপ্তকথা।' আর তার বিষয়বস্তুও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

সে যা হোক, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তখন গুপ্তকথা পাঠ করছিলেন বৈঠকখানায়।

তাঁকে দেখে শ্যামাপদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই পড়ছেন।'

জয়কৃষ্ণ জানালেন পুস্তকটির নাম।

শুনে, পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে বললেন, 'আপনার জীবন ত প্রায় শেষ হয়ে এল। এখন আর গল্প উপন্যাস পড়া কেন? এসব ছেড়ে এবার গভীর তত্ত্বের গ্রন্থ পাঠ করুন।'

এমন স্পষ্ট ভাষণেও কিন্তু জয়কৃষ্ণ আক্রান্তবোধ করলেন না। তিনিও সোজা বলে দিলেন, 'তত্ত্ব কথাও অনেক পড়েছি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি যে ওসব পড়লেও কিছুতেই কিছু হয় না।'

ন্যায়বাগীশ স্তব্ধ হয়ে গেলেন এমন বিপরীত কথা শুনে। কোন উত্তর তাঁর বাক-পটু মুখেও জোগাল না। শুধু তাই নয়। শব্দভেদী বাণের মতন তাঁর মনে গেঁথে গেল জয়কৃষ্ণের কথা কটি।

পণ্ডিত মহাশয়ের এক তীব্র আত্মজিজ্ঞাসা জেগে উঠল। তিনি সচকিত হয়ে ভাবতে লাগলেন নিজেরই সম্পর্কে। তাই ত। গভীর তত্ত্ব আমিই বা জেনেছি কি! এতকাল যাবৎ কত শাস্ত্র চর্চাই করেছি। কিন্তু কি ফল পেয়েছি? রাশি রাশি পুঁথি পড়েছি আর ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু বস্তু কোথায়? আমার জীবনেরও ত অনেকখানি গেল। শাস্ত্র আলোচনায় ত সার বস্তু মিললনা। এখন কি করি? সাধন-ভজন যে করব সে শিক্ষাও কিছু পাইনি। তাহলে মুক্তি পাব কি করে?

এমনি ভাবনায় কাতর হলেন ন্যায়বাগীশ।

আর সেই চিন্তার মধ্যে শাস্ত্রেরই একটি বচন মনে পড়ল। সাধু সঙ্গ করলে বস্তু পাওয়া যায়। মনে বেশ ধরল কথাটি!

জয়কৃষ্ণের গৃহ থেকে শ্যামাপদ বিদায় নিলেন। আর কৃতসংকল্প হলেন—এবার সাধুসঙ্গ করতে হবে। উদ্ধারের পথ সেখানেই।

আঁটপুরে ফিরে এবিষয়ে তৎপর হলেন।

কিন্তু সাধু সন্ধানে বেরিয়ে মহা সমস্যায় পড়লেন। তেমন সাধু কোথায়? নানা জায়গায় চেষ্টা করেও কোন সাধুর সন্ধান পেলেন না।

তবে আশায় আশায় দিন যাপন করতে লাগলেন।

এমন সময় শুনলেন এক পরমহংসদেবের কথা। গঙ্গার পূর্বকূলে

দক্ষিণেশ্বর পল্লী। সেখানকার কালী মন্দিরে এই সাধুর অধিষ্ঠান। তাঁর খুব নাম ডাক। বহু ভক্ত হয়েছেন তাঁর। অনেকে তাঁর কাছে যান। শুনে আসেন ঈশ্বরীয় কথা।

ন্যায়বাগীশও দক্ষিণেশ্বরে যাবার মনস্থ করলেন।

তখন একবার অহমিকাও জাগল বটে। এত বড় পণ্ডিত আমি। অযাচিত একজনের কাছে যাব!

কিন্তু নিজেরই গরজ। না গিয়ে উপায় কি। সাধু ত এ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। এখানে গিয়েই দেখা যাক। ইনি কেমন সাধু। বস্তু কিছু পাওয়া যায় কিনা এঁর কাছে।

এমনি ভেবে একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন। মন্দির চত্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরমহংসের সংবাদও পেলেন। গঙ্গাতীরের কক্ষটিতে উপনীত হলেন বারান্দার ধারে।

তখন প্রায় অপরাহ্ণ। ঠাকুর তাঁর ঘরে বসে রয়েছেন। সামনে ভক্তরা। তিনি ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করছেন পরমানন্দে। শ্রোতারাও সাগ্রহে সেই কথামৃত পান করছেন।

সেদিন বেশ কয়েকজন সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন ভক্তদের মধ্যে। তা তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদেই বোঝা যায়। কেউ কেউ এসেছেন গাড়িতে।

ন্যায়বাগীশ দরজার সামনে থেকে ভেতরে একবার দেখলেন। আত্মম্ভরী ব্যক্তি। তাই পাদুকাও খুললেন না। সরাসরি ঢুকে গেলেন ঘরের মধ্যে।

আগন্তুকের এই ঔদ্ধত্যে কিন্তু ভক্তেরা সঙ্কুচিত হলেন। বিস্ময়ে কোন কথা ফুটল না তাঁদের মুখে। ঠাকুরের দিকে তাঁরা চাইলেন। তাঁর অধরে মৃদু হাসি।

শ্যামাপদ ভক্তদের প্রশ্ন করলেন, 'এখানে পরমহংস কে ? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

সৌজন্য বা বিনয়ের লেশমাত্র নেই তাঁর কণ্ঠস্বরে। তা হোক, ভক্তরা ঠাকুরকে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তক্তাপোষে বসে।

পণ্ডিত তাঁকে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্মদৃষ্টিতে। নিতান্ত সাদামাঠা চেহারা। পরণের কাপড় খানিকটা কাঁধে ওঠানো। সাধারণ গৃহস্থের মতনই দেখতে। সাধুর কোন চিহ্নই শরীরে নেই। গৈরিক বসন বা জটাজাল, ভস্ম মাখা অঙ্গ—কিছুই না। খাটো ধুতিটা লাল পাড়। পান খাওয়া মুখে লাল ছোপ!

এ ত সামান্য এক বামুন। মুখে পাণ্ডিত্যেরও কোন ছাপ নেই। এই স্থির করে ন্যায়বাগীশ ঠাকুরের পাশেই বসে পড়লেন।

কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল পণ্ডিতের মুখে চোখে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে তিনি ঘরের সব দেখে নিলেন।

তারপর তামাশাচ্ছলেই ঠাকুরকে বললেন, 'তুমিই তাহলে পরমহংস? দেখে ত বোঝবার উপায় নেই। বাঃ বেশ মজায় এখানে রয়েছ ত! কি করে এত লোক জড় করলে। এমন জমাট আসর বসালে।'

ঠাকুর নির্বাক, যদিও হাসি-মুখ। ভক্তরা স্তম্ভিত এমন বিশ্রী বাক্যে।

বক্তা তেমনি ভঙ্গিতেই শোনালেন, 'আমি এতকাল শাস্ত্রচর্চা নিয়ে আছি। কিন্তু কি আর হল আমার। আর তুমি কেমন পরমহংস নাম নিয়েই এমন পসার জমিয়ে ফেল্‌লে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন প্রতিবাদ করলেন না। রাগ বা বিরক্তিও দেখা গেল না তাঁর। বরং হাসির আভাস মুখে চোখে। অতিথির দিকে তিনি চেয়ে আছেন।

আগন্তুক ঘরের জিনিসপত্রও দেখছিলেন সমালোচকের দৃষ্টিতে। খাটে ধবধবে পুরু বিছানা। পরিচ্ছন্ন মশারি। পাশে আরেকটি ছোট খাট বা তক্তাপোষ, বসার জন্যে। তার একদিকে মোটা তাকিয়া। নীচে মেঝেয় পাপোশ পাতা। ঘরের চার দেয়াল পরিস্কার চুনকাম করা। নানা দেব দেবীর ছবি টাঙানো। ঘরের এক কোণে গঙ্গাজলের জালা। তার পাশের পাটাতনে কয়েক রকম ফল রাখা। একদিকে কাপড়ের আলনা। আর একদিকে মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাবার। ওপরের শিকে ঝোলানো হাঁড়ি। দেয়ালের এক কোণে রাখা হুঁকা, তার মুখে বকুলপাতার নল। একটি জলপানের পাত্র। কোন জিনিসই মূল্যবান নয়। তবে সবই পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি।

অতিথি নিরীক্ষণ করছেন জিনিসগুলি। আর ঠাকুরও তাঁকে আঙ্গুল তুলে একেকটি দেখিয়ে দিচ্ছেন। যেন বাদ না যায় কিছু। তিনিও এখন কৌতুকী। রঙ্গ করছেন দাম্ভিক পণ্ডিতকে নিয়ে। তবে নির্বাক হাবভাবে। ভক্তরাও এবার বুঝেছেন যে ঠাকুর আগন্তুকের সঙ্গে রহস্য-পর হয়েছেন।

জিনিসপত্র দেখে, পণ্ডিত এবার লক্ষ্য করলেন উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে।

তারপর ঠাকুরকে ব্যঙ্গভরেই বললেন, 'এতজনকে তুমি কি করে বশ করলে? দেখে মনে হয় এরা অনেকেই অবস্থাপন্ন ঘরের। এতগুলি লোককে তুমি ধোঁকা দিয়ে নষ্ট করছ নিজে পরমহংস নাম নিয়ে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও মৌন। অন্য সকলেও হতবাক। বক্তা এবার ভক্তদের শোনাতে লাগলেন, পাণ্ডিত্য ফলিয়ে—'আমার কাছে শোন, পরমহংস কাকে বলে। শাস্ত্রে পরমহংসের সব লক্ষণ দেওয়া আছে।'

বলে, শাস্ত্রবাক্য ও তার ব্যাখ্যা শোনালেন। তাঁর বক্তব্য, প্রকৃত পরমহংস নন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর এইসব কথার মধ্যে তেমনি হাসিমুখে রইলেন। এদিকে বিকাল শেষ প্রায়।

তাই দেখে তিনি সবিনয়ে বললেন অতিথিকে, 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আজ তুমি এখানেই থাকো। অনেক দূরে ত তোমার বাড়ি।'

নিরভিমান ঠাকুর। পরম কারুণিক। এতক্ষণ এমন অপমানের প্রতিদানে তাঁর সৌজন্য।

ন্যায়বাগীশ কি ভেবে রাজি হলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে গঙ্গাতীরে গেলেন, আহ্নিক করতে।

এদিকে ঘরে ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর বাইরে এলেন বাগানে। আপন মনে বেড়াতে লাগলেন। কখনো ফুলগাছের সামনে। কখনো গঙ্গার ধারে। পঞ্চবটীতে। তার ডালে ডালে পাখিদের কাকলি শোনা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে তারাদলের মধ্যে।

খানিক পরে ঘরে ফিরলেন। দেব দেবীর দিকে বিচরণ করতে লাগলেন, ভাবাবিষ্ট হয়ে।

ওদিকে পণ্ডিত গঙ্গাতীরে রয়েছেন। চাঁদনীতে। প্রথমে সন্ধ্যাহ্নিক করে নিলেন। তারপর চোখ বন্ধ করলেন ইষ্টদেবতার স্মরণ মননে।

কিন্তু, আশ্চর্য ব্যাপার। যতবার তিনি ইষ্টকে মনে করতে চাইলেন ততবারই শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি ফুটে উঠল। একবার নয়, প্রতিবার।

তিনি তখন চিন্তা করলেন, চোখ খুলে। তাঁর মনে হল, অনেক ক্ষণ পরমহংসের কাছে ছিলেন। তাই কেবল এসে পড়ছে তাঁর রূপ। পরে

আর এমন হবে না।

এই ভেবে তিনি আবার চোখ বুজলেন। কি বিচিত্র ব্যাপার। এবারও তাঁর মনে এল না ইষ্টমূর্তি। কেবল পরমহংস দেখা দিতে লাগলেন। তাঁর মানসপটে। এতকাল যাঁকে স্মরণ মনন করেছেন, যে রূপ চিরমুদ্রিত ছিল চিত্ত-যবনিকায়, আজ শত চেষ্টাতেও তার সাক্ষাৎ মিলল না।

এবার নিরস্ত হলেন ন্যায়বাগীশ। ব্যাপারটি আবার বিবেচনা করতে চাইলেন। কিন্তু কোন কারণ ঠিক করতে পারলেন না। এখন তাঁর মনে বিস্ময়ের চেয়ে বেশি জাগল এক সংশয়। বার বার চেষ্টা করেও ইষ্টদেবকে দেখতে পাচ্ছিনা, কেবলই পরমহংসের মূর্তি আসছে। তাহলে কি ইনিই আমার ইষ্ট?

পণ্ডিত চক্ষু মুদ্রিত করলেন পুনরায়। সন্দেহ এবার ধারণায় পরিণত হল। প্রত্যয় করলেন যে পরমহংসদেবই তাঁর ইষ্ট। তিনি চোখ মেলে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গেলেন ঠাকুরের ঘরে। কোথায় সেই গর্বোদ্ধত ভাব। ঠাকুরের পাশে বসাও আর নয়। তাঁর পায়ের নীচে বসলেন মেঝেতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ খাটে ভাবাবিষ্ট হলেন। আবেশের মধ্যে ডান পা রাখলেন পণ্ডিতের মাথায়।

ন্যায়বাগীশ এতক্ষণে সেই চরণের মাহাত্ম্য বুঝেছেন। তিনি সসম্ভ্রমে পা দুটি নিলেন আপন হাতে। আর ঠাকুরের স্তব করতে লাগলেন।

চোখের জলে আপ্লুত হয়ে বার বার বললেন, 'আমায় চৈতন্য দিন। ভক্তি দিন।'

তারপর ঠাকুরের চরণ ধরে প্রার্থনা জানালেন, 'রূঢ় বাক্য উচ্চারণের

জন্যে আমায় মার্জনা করুন, দেব।'

আর ভক্তদের দিকে ফিরে বললেন, 'ইনি মানব দেহে ঈশ্বরের অবতার। আমি অন্ধ ছিলুম পাণ্ডিত্যের দম্ভে। তাই এই জ্যোতি আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু তিনি পতিতপাবন। আমাদের মত ব্যক্তিকে ত্রাণ করতে এসেছেন। তিনি আমার অপরাধ আগেই ক্ষমা করেছেন। এখন আপনারা আমায় মার্জনা করুন।'

রামলালের গান আরম্ভ

শ্রীরামকৃষ্ণের গানের ভাণ্ডারী ছিলেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরের রচনা নয়, যেসব গান তাঁর প্রিয়, যা তিনি গাইতে ও শুনতে ভালবাসতেন অন্য পদকর্তাদের সঙ্গীত। তাঁর নির্দেশেই রামলাল লিখে রাখতেন প্রস্তুতির জন্যে। তাঁকে গেয়ে শোনাতে হত।

অনেক সময়ই ঠাকুর তাঁকে ফরমায়েশ করতেন। 'রামলাল ওই গানটা গা ত।'

কিংবা কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে, কোন ভাবের গান গাইতে বলেছেন তাঁকে। রামলালও ঠিক শুনিয়েছেন। গানের জন্যে তাঁর একটি ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে। তাঁর গায়ক জীবনের সঙ্গে ঠাকুরের প্রায় দৈনন্দিন সংযোগ ছিল। আর তা নিবিড়, কারণ ভাবলোকের অনুষঙ্গ। সাধারণ চিত্তবিনোদনের গান নয়।

কিন্তু কিভাবে গান আরম্ভ হয় রামলালের ?

সে বিবরণ অলৌকিক। তার আগে তাঁর সাঙ্গীতিক পরিচয় আরো

দেবার আছে।

দেখা যায়, তিনিই সব চেয়ে বেশি সঙ্গীত-সঙ্গ দিয়েছেন ঠাকুরকে। নরেন্দ্রের চেয়েও। নরেন্দ্রর সঙ্গে যতদিন ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়েছে তার বেশির ভাগই গীতিমুখর। হয় ঠাকুর না হয় নরেন্দ্র কিংবা দুজনেই গান গেয়েছেন। এজন্যে ঠাকুরের সঙ্গীত পরিবেশের কথায় মনে আসে নরেন্দ্রের প্রসঙ্গ। কিন্তু তিনি ঠাকুরের সঙ্গ পান পাঁচ বছরেরও কম। কিন্তু রামলাল ঠাকুরের সেবক ছিলেন দীর্ঘ চোদ্দ বছর। এতকাল ধরে তাঁর সেবা পরিচর্যা আর কেউ করেননি, হৃদয়রাম ভিন্ন। তেইশ বছরের সেবক হৃদয়। কিন্তু তাঁর এমন গীতপ্রধান ভূমিকা ছিল না। যদিও হৃদয় গায়ক এবং কখনো কখনো গান গেয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে, কিন্তু সংখ্যায় তা যৎসামান্য। আর বিশেষ করে ঠাকুরকে তাঁর গান শোনাবার কথা তেমন জানা যায়নি।

আর সেবকরূপে রামলালের প্রধান করণীয় ছিল ঠাকুরকে গান শোনানো। এক যুগেরও বেশি তিনি ঘনিষ্ঠ সেবক ঠাকুরের। দক্ষিণেশ্বরে ১৮৭২ থেকে কাশীপুর বাড়িতে ১৮৮৬ পর্যন্ত। বিশেষভাবে রামলালের গান শিক্ষাও তাঁরই জন্যে। পারিবারিক জীবনেও নিকট আত্মীয়। ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র রামলাল। এতকাল একত্র বাসের জন্যে খুবই কাছে থেকে ঠাকুরকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সেজন্যে তাঁরই মাধ্যমে জানা গেছে ঠাকুরের কিছু অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, মন্তব্য, ধারণা ইত্যাদি —বিশেষ সঙ্গীত সম্পর্কে।

রামলালের তেমনি কয়েকটি বিবৃতি এখানে উদ্ধৃত করা যায়।

একদিন রামলাল গাইলেন এই গানটি—'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা ··।' আবার গানের সঙ্গে নৃত্য করে দেখালেন। বললেন, (এই

গানখানি) 'ঠাকুর এমনি করে গাইতেন ও হাততালি দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচতেন আর পা ফেলে ফেলে তাল দিয়ে নাচতেন।'

তিনি আরেকটি গান শোনালেন—ঠাকুরের একটি বিশেষ প্রিয় শ্যামাসঙ্গীত—'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরাণী শ্যামা মাকে···!' গেয়ে বললেন—'ঠাকুর এমনি করে গাইতেন।'

রামলাল আরো জানান—'ঠাকুর রামপ্রসাদের গানের মধ্যে এই গানটি বেশ টানটুন দিয়ে রকমারি করে গাইতেন ও নাচতেন—ক্ষেপার হাট বাজার মা তোদের, ক্ষেপার হাট বাজার···।'

আর একদিন রামলাল একটি গান গাইছিলেন—'কেন মা তোর পাগলীর বেশ···।'

শুনে একজন জানতে চাইলেন, 'এটা কি সুর?'

রামলাল উত্তর দিলেন, 'এটা ঠাকুর ঠুংরিতে গাইতেন। আজকাল-কার মত তিনি ঠুংরি গাইতেন না। তিনি সেটি গাইতেন অতি ভাবের সঙ্গে, আহা, কি মিষ্টি মধুর লাগত।'

রামলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল কমলকৃষ্ণ মিত্র নামে এক ভক্তের। তিনি লিখেছেন যে, রামলাল দাদার স্বভাবটি ছিল অতিশয় স্থির ও নম্র, সর্বদাই ভগবৎ প্রেমে তন্ময়। আবার রসিকতায় ভরপুর ·· অতি সৌম্য মূর্তি···। বক্তব্য কথাগুলি অতি বিবেচনা করে তিনি আস্তে আস্তে বলেন। কোনরূপ বেফাঁস বা মিথ্যা বলেন না। শুনতে পাই, ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন যে, 'সত্যতে থাকবি, তাহলে ভগবান পাবি. সত্যই কলির তপস্যা।'

কমলকৃষ্ণের জবানীতে আরো পাওয়া যায়—'আবার শুনেছি, ঠাকুর দাদাকে অতিশয় ভালবাসতেন, তিনি দাদাকে বহু বিষয়ে শিক্ষা

দিয়েছিলেন। কি করে পুজো করতে হয়, গান করতে হয়, সেবা করতে হয় ইত্যাদি। রামলাল দাদা সর্বদাই তাঁর কাছে থেকে সেবা করতেন।… রাখাল মহারাজ দাদাকে নিয়ে অনেক সময় খুব রগড় ও খাতির করতেন।'

রাখাল মহারাজ অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁর একটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায় রামলাল সম্পর্কিত। সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর জানা ছিল যে, দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সেবার জন্যে রামলাল ঠাকুর সম্পর্কে অনেক বিষয় অবহিত ছিলেন। ঠাকুরের কৃপা লাভ করেও ধন্য তাঁর জীবন। তাই ঠাকুরের তিরোধানের পরবর্তী-কালে তাঁদের প্রিয়জন থাকেন রামলাল। কারণ তাঁর মাধ্যমে তাঁরা ঠাকুরের স্মরণ মনন ও ভাব অনুষঙ্গ করতেন। ঠাকুর সম্পর্কে কিছু কিছু সাঙ্গীতিক বিবরণও দেন তিনি। জিজ্ঞাসুদের কাছে তাঁর কোন কোন অন্তরঙ্গ বৃত্তান্ত ও বার্তা জানান। আর ঠাকুর সম্পর্কে রামলাল চিহ্নিত হয়ে আছেন প্রধানত তাঁর গায়ন-গুণে। গায়ক রামলাল এবং তাঁর নানা দিনের গান শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণের সঙ্গে যেন অবিচ্ছেদ্য, তাঁর সঙ্গীত-প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তেমনি একজন। তিনি এজন্যে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমাদর করতেন।

তাঁদের একটি হৃদয়গ্রাহী প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায় এখানে। রামলালের গীত-অনুষঙ্গে বিগত যুগের একটি প্রাণবন্ত স্মৃতি—অবশ্যই ঠাকুরের দেহত্যাগের অনেক পরের কথা—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাঝে মাঝে বেলুড় মঠ থেকে বলরাম মন্দিরে আসতেন। তেমনি এসেছেন সেবারে। তখন রামলাল তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে এলেন।

ব্রহ্মানন্দ উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন তাঁকে দেখলে। হাস্য কৌতুকালাপে মুখর হতেন। সেদিনও কথায় কথায় একটি রঙ্গ-ভরা অনুরোধ করলেন রামলালকে। ঢপ-গায়িকার বেশে ঢপ কীর্তন শোনানো। তিনি বললেন, 'দাদা, আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো—ঠাকুরের সময়কার গান শোনাতে হবে।'

রাজী হতে হল রামলালকে। বলরাম-গৃহের দোতলায় হল্ ঘর। সেখানে তিনি ঢপ কীর্তন গায়িকার সাজে আসরে দেখা দিলেন।

হাত নেড়ে নাচতে নাচতে আরম্ভ করলেন এই বিশেষ রীতির গান—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত—
(ও তোর) মন থাকে তো থাকবি সেথা নইলে আসবি দ্রুত।
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে—
(বললে বলতেও পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)
না হয় ব্রজ নারীর নয়ন নীরে চরণ পাখালিবে।

গান শুনতে শুনতে রাখাল মহারাজের ভাবান্তর ঘটল। গভীর ভাবের দ্যোতনায় গম্ভীর হয়ে গেল হাসিমুখ। গানের কলি কোন্ সুদূর অতীত স্মৃতি জাগিয়ে দিতে লাগল। সব আনন্দকে ছাপিয়ে উঠল নিগূঢ় বিরহ বিষাদ।...

রামলালকে যে ঠাকুরের গানের ভাণ্ডারী বলা হয়েছে, তার কারণ তিনি ঠাকুরের অনেক প্রিয় গান খাতায় লিখে রাখতেন। রামলালের একটি বিবৃতি থেকেই জানা যায় একথা—

'৪ঠা বৈশাখ, বুধবার, অন্নপূর্ণা পূজা, ১৩৩৭ সাল। রামলাল দাদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে 'কহে কিশোরী' ও 'শিবের তুল্য জামাই' এই

দুখানি গান গেয়ে বললেন—একদিন সকালে দুর্গাপূজার ৪।৫ দিন আগে আমি ঠাকুরকে নিয়ে শৌচে গেছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, ভূষণ মালাকর (জেলে) গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরছে আর 'ওহে শিখরী জামাই নাই ভিখারী' ঐ গান গাচ্ছে, ঠাকুর শুনে সমাধিস্থ।

তারপর ঠাকুর আমায় বললেন, 'ওরে রামলাল দেখ্, কি সুন্দর গান হচ্ছিল রে, তুই শুনেছিস ?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তিনি বললেন, 'ওকে একবার ডাক না।'

আমি ভূষণকে ঠাকুরের ঘরে ডেকে আনলুল। সে ঠাকুরকে ওই দুখানা গান শোনালে। তিনি শুনে চোখের জলে ভেসে গেলেন ও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তারপর ঠাকুর আমায় বললেন, 'ওরে ভূষণকে কিছু খাবার দে।'

আমি লুচি সন্দেশ প্রচুর পরিমাণে দিলুম।

ঠাকুর তাকে বললেন, 'তুমি রবিবার এসে গান শুনিও আর প্রসাদ পাইও।'...

ঠাকুর আমায় বললেন, 'ওরে রামলাল, ভূষণের কাছ থেকে গান-গুলো লিখে নে।'

আমি লিখে নিলুম ও ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে গেয়ে শোনাতুম। আর তিনিও গাইতেন—(কীর্তন) কহে শিখরী জামাই নাই ভিখারী। শিবের এখন স্বর্ণপুরী।...

'কথামৃত'তে অনেকবার পাওয়া গেছে রামলালের কথা। পরমহংস-দেবকে তাঁর গান শোনাবার উল্লেখ। গায়ক-রূপেই নানা স্থানে রাম-লালকে পাওয়া গেছে। শ্রীম জানিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরে ও অন্যত্র তিনি

গান শোনান ঠাকুরকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশ যে, ঠাকুরের সামনে রামলাল শ'খানেক গান গেয়েছেন। বোঝা যায়, তার চেয়েও বেশি সংখ্যক গান জানতেন তিনি। কারণ যত গান শোনান, সবই উল্লিখিত হতে পারে না। যেমন, কথামৃত'তে ঠাকুরের মাত্র ১৭৯ দিনের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যেসব রবিবার বা ছুটির দিনে শ্রীম গেছেন তাঁর কাছে। তাও ঠাকুরের জীবনের শেষ সাড়ে চার বছরে। কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে, রামলাল চোদ্দ বছর ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন। সুতরাং আরো অনেক গান তিনি শোনাতে পারেন ঠাকুরকে।

সে যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় রামলাল গান আরম্ভ করলেন, বিবরণীতে প্রতিবার পাওয়া যায়। কোথাও লেখা দেখে গান করেননি, এমন তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল গানগুলি। সুতরাং তিনি বিলক্ষণ স্মরণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন। ছত্রিশ পঙক্তির সুদীর্ঘ একটি গানও গেয়েছিলেন রামলাল।

ঠাকুর কি সঙ্গীত প্রিয়ই ছিলেন। এক কথায় তার হুবহু বর্ণনা দেন শ্রীমা--'ঠাকুর গানে ভাসতেন।' স্বয়ং ত অক্লান্ত গায়ক। অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে যাঁদের গায়ণগুণের কথা শুনতেন, তাঁদেরই গান শোনাতে অনুরোধ করতেন। নিজে যেখানে আমন্ত্রিত হয়ে যেতেন, সেখানেও ব্যবস্থা করতে হত সঙ্গীতের। তাতেও তিনি তৃপ্ত নন। উপরন্তু সর্বদা তাঁকে গান শোনাবার জন্যে কাছে রাখতেন রামলালকে। আর সেজন্যেই রামলাল তাঁর গানের ভাণ্ডারী। বিভিন্ন তত্ত্বকথা তিনি ভক্তদের কাছে বলতেন। আর সেই গান শোনাতে ফরমায়েশ করতেন রামলালকে। গায়কের এটি কম দায়িত্বের কাজ নয়। প্রচুর গান কণ্ঠস্থ

রেখে এজন্যে প্রস্তুত থাকতে হত। গান শোনাবার আদেশ কেবল দক্ষিণেশ্বরেই যে পেতেন তাও নয়। কোন ভক্তগৃহে ঠাকুরের উপস্থিতিতেও গাইতে হত রামলালকে। বিশেষ বিশেষ ভাবের গান প্রয়োজনে শোনাবার জন্যে ঠাকুর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এমনি কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায় 'কথামৃত' থেকে—

যেমন, একদিন ঠাকুর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অধরলাল সেনের বাড়িতে (আহিরীটোলায়) এসেছেন। রামলাল প্রথমে গাইলেন 'ভুবণ ভুলাইলি মা হরমোহিনী। মূলাধারে নীলোৎপলে, বীণাবাদ্য বিনোদনী ' মহারাজা নন্দকুমার রচিত এই তত্ত্ববিষয়ক গানখানি। তারপরে শোনালেন সেই ছত্রিশ পঙক্তির সুদীর্ঘ গানটি—'ভবদারা ভয়হারা নাম শুনেছি তোমার …পঞ্চে পঞ্চে লয় হলে তুমি নিরাকার।'

আর একদিনের কথা। ঠাকুর 'রামলালকে গান গাহিতে বলিতেছেন শ্রীযুক্ত রামলাল গান গাহিতেছেন—

১। কে রণে নাচিছে বামা নীরদ বরণী,
শোণিত শায়রে যেন ভাসিছে নব নলিনী।

এইবার রামলাল রাবণ বধের পর মন্দোদরীর বিলাপ গান গাহিতেছেন—

২। কি করলে হে কান্ত! অবলারি প্রাণকান্ত,
হয় না তাহা শান্ত এ প্রাণান্ত চিনে।…

শেষ গানটি শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।…

৩। শুনেছি রাম তারক ব্রহ্ম, মানুষ নয় রাম জটাধারী।

৪। ধোরো না ধোরো না রথ-চক্র, রথ কি চক্রে চলে…'

অন্য একদিন রামলাল গাইলেন—প্রথমেই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস—

কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটীরে…

তারপর ঠাকুরের ইঙ্গিতে রামলাল আবার···গাইতেছেন—

নব নীরদ বর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে···'

আর একদিন—'ঠাকুর···রামলালকে গাইতে বলিলেন। তিনি মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন, ঠাকুর এক একটি গান ধরাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গাইতেছেন···।

রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বলছেন নিমাই! কেমন করে তোকে ছেড়ে থাকবো?

ঠাকুর বলিলেন, সেই গানটা গা তো।

(রামলাল গাইতে লাগলেন) ১। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই···

২। রাধার দেখা কি পায় সকলে

নব নীরদ বর্ণ কিসে গন্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে···

ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন—সেই গানটি গা,—গৌর নিতাই তোমরা দু ভাই

রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছেন—

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়ালু হে প্রভু··,

এইসব বিবরণ থেকে বোঝা যায়, রামলালের গানের শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল শ্রোতা ছিলেন না, কোন কোন সময়ে সহযোগিতাও করতেন গান গেয়ে। রামলালকে 'মধুর কণ্ঠ' গায়ক বলেও 'কথামৃত'কার উল্লেখ করেছেন।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামলাল দু'খানি গান শোনান ঠাকুরকে। সেদিন গানের সঙ্গে শুধু একটি বাঁয়াতে ঠেকা দেবার কথা শ্রীম জানিয়েছেন। সুতরাং বোঝা যায় রামলাল অন্যদিনে গান করেন তবলা বাঁয়ার সম্পূর্ণ ঠেকা যোগে।

একদিন (১৮৮৪ সালের) কালী পূজার রাত। ঠাকুর রামলালকে বললেন, 'একটু গা, আজ পূজা।'

রামলাল গাইলেন—সমর আলো করে কার কামিনী···

গান শেষে ঠাকুর প্রেমানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। আর নাচতে নাচতে গান ধরলেন—মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে···।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কথায় রামলাল গাইলেন—প্রথমে দুটি শ্যামাসঙ্গীত। আবার তাঁর আদেশে শোনালেন দুখানি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে রামলালের গানের এমনি নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। আর উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

গায়ক হিসাবে রামলালের যোগ্যতা এবং ঠাকুরের ভাব-জীবনে তাঁর একটি ভূমিকা স্মরণ করবার জন্য দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হল।

এখন প্রসঙ্গ—রামলালের গায়ক জীবনের উদ্‌বোধন।

যিনি এতদিন ঠাকুরকে গান শুনিয়েছেন 'মধুর কণ্ঠে,' আদেশ মাত্র নির্দিষ্ট ভাব বা বিষয়ে গেয়েছেন উপযুক্তভাবে, তাল মান যোগে—এত গান যাঁর কণ্ঠস্থ ছিল— তিনি কেমন করে গায়ক হন?

শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ বিভূতির প্রসাদে!

রামলাল আদৌ গায়ক ছিলেন না। অকস্মাৎ তিনি গায়ক হয়ে ওঠেন ঠাকুরের ইচ্ছায়। রামলালের গান আরম্ভ ঠাকুরের শক্তিসঞ্চারে।

তার আগে তিনি গান গাইতেন না। তাঁর সঙ্গীত-কণ্ঠ শোনা যায়নি কখনো। এমন কি, বাক্য উচ্চারণে তাঁর জিহ্বার জড়তাও পরিবারে জানা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর গানের সূত্রপাত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবী শক্তিতে।

সেই আশ্চর্য কাহিনী প্রকাশ করেছেন রামলালেরই পুত্র—হরিহর চট্টোপাধ্যায়।

'স্মৃতিকথা' পুস্তকে হরিহরের বিবৃতিটি এই প্রকার—

বাইরেকার যে ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে আসতেন তাঁরা কেউ কেউ গায়ক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গান শুনিয়ে যেতেন। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরত না। তিনি ভাবতেন, যখনই ইচ্ছা হবে তখনই যদি কেউ গান শোনায় তাহলে বেশ হয়। আর এমন গায়ক সেবক পাশে থাকলেই তা সম্ভব।

সেসময় সর্বদা তাঁর কাছে থাকতেন রামলাল।

তাই একদিন ঠাকুর মা কালীর কাছে প্রার্থনা করলেন—মা, রামের গলাটা যেন খুলে যায়। তা হলে বেশ হয়।

তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন জগজ্জননী। ঠাকুরের যোগ বিভূতি রামলালের ওপর প্রকাশ পেলো।

ঘরের পূবদিকে বারান্দায় তিনি বসলেন রামলালকে নিয়ে। তারপর নিজে গান ধরলেন এবং রামলালকেও গাইতে আদেশ করলেন।

গান আরম্ভ হল রামলালের কণ্ঠে! তিনি ঠাকুরের সঙ্গে গাইতে লাগলেন!

শুনে ঠাকুরের কি আনন্দ। তারপর তাঁকে বললেন, 'যা, তোর খুড়িকে ডেকে নিয়ে আয়।'

অর্থাৎ সারদা দেবীকে, নহবৎখানার নীচের ঘর থেকে।

রামলালের সঙ্গে শ্রীমা এলে, ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'রাম গান গাইবে। তুমি শুনবে। তাই ডেকেছি।'

তাঁর কথা শুনে শ্রীমা'র বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাম গান গাইবে!

তার মুখ দিয়ে ত স্পষ্ট কথাই উচ্চারণ হয় না! সে গান করবে?

সারদা দেবী বললেন, 'সে কি? ওর মুখ দিয়ে যে 'রা' বেরোয় না। ও কি করে গান গাইবে?'

ঠাকুর জানালেন, 'না গো না, তুমি ভেবুনি। মাকে বলে সব ঠিক করে দিইছি।'

এবার রামলাল গাইলেন শ্রীমার সামনে।

সারদা দেবী যেমন আশ্চর্য তেমনি খুসি হলেন। আর মনে মনে বললেন, 'ঠাকুরের পক্ষে সবই সম্ভব।'

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের আলৌকিক দর্শন

ঠাকুরের এক বিশেষ প্রিয় গৃহী ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ঠাকুর তাঁকে আদর করে কখনো ডাকেন 'সুরেশ' বলে, কখনো বা 'সুরেন্দর।'

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চার 'রসদদারে'র অন্যতম। অপর তিনজন হলেন—মথুরবাবু, শম্ভুচরণ মল্লিক ও বলরাম বসু। 'সুরেন্দ্র অনেকটা রসদ্দার বলে বোধ হয়'—ঠাকুর বলেছিলেন একদিন।

একটি ইউরোপীয় সংস্থার মুৎসুদ্দি তিনি। বেশ সচ্ছল অবস্থা ঠাকুরের সেবায় দরাজ হাতে তার সদ্ব্যবহার করেন। রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে সেবকরূপে তাঁর এক বিশিষ্ট ভূমিকা। অলক্ষ্যে আনুকুল্য করে যান নানাভাবে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবাদির জন্যে কোন কোন ভক্তের রাত্রিযাপন করতে হয়। তাঁদের জন্যে লেপ, বালিশ, ডাল রুটির ব্যবস্থা সুরেন্দ্র-

নাথের।

কাশীপুর বাগানবাড়ির মালিক আশী টাকা ভাড়া তাঁর প্রদত্ত। বরানগরে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের প্রথম মঠ তাঁরই আনুকুল্যে স্থাপিত।

১৮৮১ সালে ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব পালনও তাঁর যত্নে ও দাক্ষিণ্যে। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক সেই জন্ম-তিথি অনুষ্ঠানের সকল ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। তৃতীয় বর্ষ থেকে অন্যেরাও কিছু কিছু দিতে থাকেন, ভক্তমণ্ডলীর প্রস্তাবে। তাহলেও সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন সেই মহোৎসবের প্রাণ।

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের প্রথম যোগাযোগের উপলক্ষ্য হন তিনি। তাঁর শিমুলিয়া বাড়িতে ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্যে প্রতিবাসী নরেন্দ্রকে সুরেন্দ্রনাথ আহ্বান করে আনেন। এখানেই নরেন্দ্রকে প্রথম দেখেন ঠাকুর ও দক্ষিণেশ্বরে যেতে বলেন তাঁকে।

ঠাকুরের যে একক দণ্ডায়মান ফটোটি দেখা যায়, তাও সুরেন্দ্রনাথের কল্যাণে। রাধাবাজারের একটি স্টুডিওতে ৩০ জুন, ১৮৮৪ তিনি এটি তোলার ব্যবস্থা করেন। সঙ্গে থাকেন কালীপ্রসাদ (পরে স্বামী অভেদানন্দ)। শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি প্রতিকৃতির মধ্যে কেবল এটিই তাঁর বাহ্যজ্ঞানে নেওয়া। তারপর দুখানি— দক্ষিণেশ্বরের বিষ্ণুমন্দিরে উপবিষ্ট ও কেশবচন্দ্রের গৃহে দণ্ডায়মান— তাঁর সমাধিস্থ অবস্থার ছবি।

সুরেন্দ্রনাথ একাধিকবার ঠাকুরের যোগ বিভূতিও প্রত্যক্ষ করেন। এবার সেই প্রসঙ্গ।

আগে সুরেন্দ্রনাথদের বাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হত। পরে বন্ধ থাকে, একবার বিশেষ বাধা পড়ার জন্যে। ঠাকুরের কৃপায় সুরেন্দ্র মানসিক শক্তি পান। আর গ্রাহ্য করতেন না এসব বাধা। এবার তিনি

বাড়ির বার্ষিক পূজা আরম্ভ করলেন। ঠাকুরের অনুমতিও নেন এ সম্পর্কে। পরিবার থেকে বাধা আসে। কিন্তু তিনি তা জয় করে পূজা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আছেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে। অসুস্থ শরীর, ডাক্তার মহেন্দ্রলালের চিকিৎসাধীন।

সন্ধি পূজার রাত। সুরেন্দ্রনাথ পূজার দালানে রয়েছেন। প্রতিমার সামনে আলোর মালা। দর্শনার্থী আর নিমন্ত্রিতদের আসা যাওয়া চলছে।

পূজার আনন্দের মধ্যেও সুরেন্দ্রের মন বেদনাকাতর। ঠাকুর আসতে পারবেন না। তিনি রুগ্ন দেহে শয্যাশায়ী। একথা স্মরণের সঙ্গে, নিকট আত্মীয়দের বিরোধিতার কথাও মনে হচ্ছে তাঁর। এই পূজা নিয়ে বড় ভাই তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। আর তিনি অত্যন্ত ব্যথা পান প্রাণে। আবার দেবীর পূজা দেখে ভক্তিতেও আপ্লুত হচ্ছেন। আর মিশ্র ভাবাবেগে কাঁদছেন প্রতিমার সামনে। 'মা' 'মা' বলে দেবীকে মনের আকুলতা জানাচ্ছেন।

তখন হঠাৎ তিনি দেখলেন—ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন প্রতিমার এক পাশে। আর তাঁকে আশীর্বাদ করছেন! এই অপূর্ব দর্শনের পর তাঁর সব বেদনার উপশম হল। যেমন শান্তি তেমনি আনন্দ পেলেন প্রাণে।

ঘটনাটি স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবন কথা'র স্মৃতিচারণে বিবৃত আছে। তিনি সেসময় পূর্বাশ্রমে তরুণ কালীপ্রসাদ, শ্যামপুকুরে ঠাকুরের সেবকরূপে আছেন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে—

(শ্যামপুকুর বাসায়) শারদীয় সন্ধিপূজার সময় শ্রীঠাকুর হঠাৎ ভাবাবেশে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

নরেন্দ্র, আমি, লাটু, নিরঞ্জন তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। তিনি

ভাবাবিষ্ট হয়ে রইলেন। পরে তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বললেন, 'একটা জ্যোতির রাস্তা দেখলাম। সেই রাস্তা এখান থেকে সুরেন্দ্রের দালানে শেষ হয়েছে। সেখানে মা দুর্গার প্রতিমার এক পাশে দেখলাম সুরেন্দ্র কাঁদছে। আমরা একথা শুনে আশ্চর্য, স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

সেই রাত্রে সুরেন্দ্রবাবুর বাড়িতে নরেন্দ্র, আমার ও ভক্তদিগের নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁহার পূজার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শুনলাম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিরস্কারে তাঁর প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগায় তিনি কাঁদছিলেন ও হৃদয়ের ব্যথা দেবী দুর্গাকে জানাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, পরমহংসদেব শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করছেন। এই অপূর্ব দর্শনের পর তাঁর প্রাণে শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র-বাবুর কথা শুনে শ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় যা বলেছিলেন তার সত্যতা দেখে আমরা অবাক হলেম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঢাকায় দর্শন দানের ও সন্ধিপূজার ঘটনা দেখে আমরা ভাবিলাম—These two instances prove that Sri Ramakrishna could project his double and appear at a distance—অর্থাৎ প্রমাণ হল—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নির্মাণকায় সৃষ্টি করতে ও বাইরে দূরেও আবির্ভূত হতে পারতেন। যোগের ইহাও একটি শক্তি। তবে শ্রীঠাকুর যোগ বিভূতি প্রশ্রয় দিতেন না।...

সুরেন্দ্র আর একবার দিব্যদর্শন করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোধানের পরে। আর বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠার আগে। সেই অলৌকিক দর্শনের ফলেই মঠ স্থাপিত হয়েছিল। তার বিবরণ এই—

কাশীপুরের বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল ঠাকুরের দেহান্তের পরে।

কারণ রাম দত্ত প্রমুখ গৃহী ভক্তরা অনেকই মনে করলেন, ছেলেদের অর্থাৎ ঠাকুরের শিষ্যদের এবার ঘরে ফেরা উচিত।

কিন্তু তাঁদের তা ইচ্ছা নয়। কালীপ্রসাদ, তারকনাথ, লাটু, বুড়ো গোপাল আর ঘরে ফিরতে চাইলেন না। তাঁরা চলে গেলেন তীর্থাদিতে। নরেন্দ্র চেয়েছিলেন গুরুভাইদের নিয়ে একত্র মঠ-জীবনে থাকতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা কখনো ভোলেননি তিনি। মহাসমাধির কদিন আগে ঠাকুর তাঁকে বলেন, 'তুই ছেলেদের একসঙ্গে রাখিস। আর দেখশোনা করিস।'

কিন্তু কাশীপুর বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নরেন্দ্র তাই স্থানাভাবে কিছু করতে পারছিলেন না।

এমন সময় সুরেন্দ্রনাথের হল দিব্যদর্শন। তিনি আদেশ পেলেন।

সেদিন তিনি অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে রয়েছেন। সন্ধার সময়। হঠাৎ দেখেন, ঠাকুর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

সুরেন্দ্রকে তিনি বললেন, 'তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।'

তখনি সুরেন্দ্র উঠে পড়লেন। ছুটে চলে এলেন নরেন্দ্রের বাড়িতে। সমস্ত ব্যাপারটি তাকে জানালেন।

তারপর বললেন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে, 'ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর। সেখানে ঠাকুরের ছবি, ভস্মাদি আর তাঁর ব্যবহার করা জিনিসগুলি রাখা যায়। আর রীতিমত পূজা অর্চনা চলতে পারে। যেখানে তোমরা কমিনী কাঞ্চনত্যাগী ভক্তরা এক জায়গায় থাকতে পার। আর আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে জুড়োতে পারব।'

এই বলে, নির্দিষ্ট প্রস্তাব করলেন, 'আমি মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।'

তাঁর কথা শুনে নরেন্দ্র আনন্দে আত্মহারা হলেন। ঠাকুর যে ভার তাঁর ওপরে দিয়েদিলেন এবার তা বহন করতে পারবেন।

বাড়ির সন্ধান হতে লাগল। তারপর বরানগর নিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এই মুন্সি বাড়ি। গঙ্গার কাছে মাসিক এগার টাকায় এটি ভাড়া দেওয়া হল। ১৮৮৬ সালের আশ্বিন মাসের শেষ দিকে এখানেই পত্তন হল তাঁদের প্রথম মঠ। বরানগর মঠ।

সুরেন্দ্রনাথ দুতিন মাস ত্রিশ টাকা হিসাবে প্রথমে দিতেন। ক্রমে মঠে ত্যাগী ভাইদের আরো যোগদানে ব্যয় আরো বাড়তে লাগল। সুরেন্দ্রও দক্ষিণা বাড়িয়ে দিতে লাগলেন একশ' টাকা পর্যন্ত।

'কথামৃত'-কার শ্রীম. তাই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—'ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়া।'

অঘোরমণির 'গোপাল'

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে তিনি 'গোপালের মা' বা সংক্ষেপে 'গোপাল মা' নামে সুপরিচিতা। তবে গোপাল নামে কোন বালকের জননী—এই অর্থে নয়।

গোপাল ভাবের সাধিকা তিনি। গোপাল-মন্ত্র রূপে সিদ্ধিপ্রাপ্তা। বাৎসল্য রসের সাধনে মূর্তিমতী। রাগানুগা ভক্তির সাধনাও যুক্ত হয় তাঁর মধ্যে।

আর রামকৃষ্ণ-মণ্ডলে তাঁর স্থান এক মাতৃশক্তি রূপে। এখানে তিনি গোপাল-রূপী ঠাকুরের মা। তাই তাঁর পরিচয়—'গোপালের মা' বা 'গোপাল মা।' মণ্ডলীর সকলের কাছে তাঁর ওই নাম। কারণ এই সাধিকার ভাব-জীবনে বাল-গোপাল ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভিন্ন হয়ে থাকেন। আর তা ঠাকুরেরই মাহাত্ম্যে ও প্রভাবে।

ঠাকুরকে অবলম্বন করেই জাগে তাঁর ইষ্ট জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তিনি ইষ্টদেবকে দেখেন। ঠাকুরই হলেন তাঁর সাক্ষাৎ গোপাল। আর এই বাৎসল্য-পরায়ণার উপলক্ষ্যে ঠাকুরেরও তেমনি দৈবীশক্তি প্রকাশ পায়। গোপাল মা'র জীবন ঠাকুরের যোগ বিভূতির এক অনন্য উদারহণ।

গোপাল মা তাঁর শিষ্যা নন, গৌরীমা'র মতন। আর সুপরিণত বয়সেই ঠাকুরের কাছে প্রথম আসেন। তাঁকে প্রথম দর্শনের সময় তিনি বাষট্টি বছরের বৃদ্ধা। জপ সাধনের অবিচল নিষ্ঠায় ভক্তিতে তিনি ছিলেন উত্তম আধার। তাই ইষ্ট-রূপে ঠাকুরের নির্দেশ এখন পূর্ণতা আনে তাঁর সাধন-জীবনে।

সেই অলৌকিকী পর্যায়ের আগে গোপাল মা'র প্রথম জীবনের কথা মনে রাখা যায়।

তাঁর প্রকৃত নাম অঘোরমণি। ১৮২২ সালে তাঁর জন্ম কামারহাটিতে, দক্ষিণেশ্বর পল্লীর কিছু উত্তরে।

ন'বছর বয়সে অঘোরমণির বিবাহ হয়। সেই একবার তাঁর স্বামী সাক্ষাৎ। আর বিধবা হলেন তের বছর বয়সে। কামারহাটির পিতৃ-গৃহেই রয়ে গেলেন।

তাঁর দাদা নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল যজমানী বৃত্তি—সেই সূত্রে

কলকাতার পটলডাঙ্গায় গোবিন্দ দত্তের বাড়িতেও পৌরোহিত্য করতেন। আবার গোবিন্দ দত্তের রাধাকৃষ্ণ মন্দির ছিল কামারহাটির বাগান-বাড়িতে। বন্দ্যোপাধ্যায় ও দত্ত পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় মন্দিরের জন্যে। গোবিন্দ দত্তের অবস্থা বিপর্যয় ও মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সেবার ভার নেন এবং এখানেই বাস করতে থাকেন। অঘোর-মণিও আসতেন মন্দিরে। বিগ্রহের সেবায় তাঁকে সহায়তা করতেন। তাঁর ভক্তিভাবের জন্যে দত্ত-গৃহিণীর সঙ্গে খুবই মনের মিল গড়ে ওঠে অঘোরমণির। বাগান বাড়িতে মন্দির সংলগ্ন মেয়েমহলে অনেকগুলি ঘর ছিল। অঘোরমণিকে এখানেই থাকার জন্যে আগ্রহ জানালেন দত্ত-গৃহিণী। অঘোরমণি রাজি হলেন। গঙ্গার ধারে, শেষ দিকের ঘরটিতে বাস করতে এলেন তিনি। তাঁর ভক্তিমতী স্বভাব মন্দিরের পরিবেশে, বিগ্রহের সেবা পূজা পরিচর্যায় বড় শান্তি পেলে। দত্ত-গৃহিণী'র জন্যে তাঁর মন্ত্র দীক্ষাও হল। দত্ত বংশের গুরু ছিলেন মালপাড়া গোঁসাই আচার্যরা। অঘোরমণিও গোঁসাই আচার্যের কাছে মন্ত্র নিলেন। তাঁর গোপাল মন্ত্র।

এবার জপ সাধন আরম্ভ করলেন একান্ত নিষ্ঠায়। দিন রাতের অর্ধেক সময় তিনি জপে থাকতেন। জপে বসতেন রাত তিনটে থেকে। তিন ঘন্টার বেশি নিদ্রা যেতেন না।

বছরের পর বছর এগিয়ে চলে তাঁর সাধন জীবন। এক যুগ, দুযুগ পার হয়ে যায়। তারপর আরো কয়েক বছর। যৌবন, প্রৌঢ়ত্বের পরে অঘোরমণি বৃদ্ধা এখন। বাষট্টি বছর বয়স হল তাঁর।

১৮৮৪ সালের কথা। অগ্রাণ মাস।

দত্তগৃহিণী পরমহংসের কথা শুনলেন—কজন সঙ্গিনী নিয়ে সাধুদর্শনে

এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

তাঁদের সঙ্গে অঘোরমণিও শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দেখলেন। ঠাকুর তাঁদের ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দিলেন তাঁর ঘরটিতে বসে। ভজন গান গাইলেন। তাঁরা বিদায় নেবার সময় বললেন, 'আবার এস।'

অঘোরমণির খুবই ভাল লাগল সাধুকে। মনে হল, যথার্থ ভক্ত। সময় পেলেই এখানে আবার আসব।

কদিনের মধ্যেই এমন ইচ্ছা হল যে চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। এবার একলা। সামান্য দামের সন্দেশ কিছু এনেছেন।

ঠাকুর বললেন, 'এসেছ? আমার জন্যে কি এনেছ, দাও।'

অঘোরমণি লজ্জিত মুখে সেই সামান্য সন্দেশ দিলেন। তিনি তাই আনন্দে মুখে দিয়ে বললেন, 'তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? ঘরে নারকল নাড়ু রাখবে, তাই দু একটা আনবে। না হয় যা তুমি রাঁধবে, লাউ-শাক চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি—তাই আনবে। তোমার রান্না খেতে বড় সাধ হয়।'

শুনে অঘোরমণির মনে একটু খটকা লাগল। ভাবলেন, ধর্মকথা না বলে এমন খাবার কথা। ভাল সাধুর কাছে এসেছি ত। কেবল খাই খাই। আমি গরীব মানুষ। কোথা থেকে এত খাওয়াব? আর আসব না।'

কিন্তু যাবার সময় দেখেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাগান ছাড়তে মন চাইছে না। জোর করেই ফিরে এলেন কামারহাটি।

কদিন পরেই আবার এলেন। সঙ্গে এনেছেন লাউশাক আর সজনে-চচ্চড়ি। ঠাকুর চেয়ে খেলেন। আর 'আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা'।

তাঁর সেই আনন্দ দেখে অঘোরমণির চোখে জল এল। আর মনে হল, 'আমি কাঙাল মানুষ বলেই ঠাকুর এত সুখ্যাতি করছেন।'

তারপর তিন চার মাস তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসতে লাগলেন। আর প্রতিবারই দেখলেন, সাধুর সেই খাই খাই ভাব। 'এটা এনো', 'ওটা এনো'—খাবারের কথা কেবল।

অঘোরমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। ইষ্টদেব স্মরণ করলেন, 'গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হ'ল ? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে কেবল খেতে চায়। আর আসবনা আমি।'

কিন্তু কি সেপ্রবল আকর্ষণ। কাটাতে পারেন না কিছুতেই। পুনরায় আসতে হয়।

তিনি কি করে বুঝবেন যে, ঠাকুর তার মধ্যে মাতৃভাব জাগিয়ে দিচ্ছেন। সন্তানহীনার মধ্যে বাৎসল্য ভাব আনছেন খাওয়ার আবদার করে। খাবার লোভের জন্য নয়।

এইভাবে আরো কিছুদিন গেল।

সেদিন গভীর রাত। তিনটে থেকে জপে বসেছিলেন। প্রাণায়াম আরম্ভ করবেন জপের শেষে। এমন সময় হঠাৎ দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পাশেই বসে। ডান হাত মুঠো করে, আর মুখে মৃদু হাসি। ঠিক যেমন তাঁকে দেখেন দক্ষিণেশ্বরে।

অঘোরমণি মহা আশ্চর্য হলেন। একি ! এমন সময় ইনি কি করে এলেন ?

ভাবতে ভাবতে সাহস করে তাঁর বাঁ হাত ধরতেই মূর্তি অদৃশ্য। আর সেখানে দেখা দিলেন শিশু গোপাল !

শুধু আসা নয়। হামা দিয়ে কাছে এসে, এক হাত তুলে বললেন, 'মা, ননী দাও।'

অঘোরমণি প্রথমে স্তম্ভিত। তারপর কেঁদে উঠে বললেন 'বাবা,

আমি দুঃখিনী। ননী কোথায় পাব? আমি তোমায় কি খাওয়াব?'

গোপাল কিন্তু নাছোড। ননী খাবেই।

তখন শিকে থেকে নারকল বার করে দিলেন—'বাবা গোপাল, আমি এই সামান্য জিনিস দিলুম।'

কিন্তু জপ আর সেদিন কি হবে! গোপালের লীলা চলতে লাগল। অঘোরমণির কোলে ওঠেন। মাথায় চড়েন। হামা দিয়ে বেড়ান ঘরময়! গোপালকে নিয়েই তাঁর কেটে গেল সারা রাত।

সকাল হতেই তিনি পাগলিনীর মতন ছুটলেন। দক্ষিণ্বরের পথে। গোপালকে বুকে নিয়ে চল্‌তে চল্‌তে দেখলেন, গোপালের লাল লাল পা দুটি তাঁর বুকে ঝুলছে।

কোনরকমে এসে পৌঁছলেন ঠাকুরের ঘরে, 'গোপাল গোপাল' বলতে বলতে। তাঁর আলুথালু বেশ। চোখ কপালে উঠেছে। আঁচল লুটোচ্ছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। এসেই তিনি ঠাকুরের পাশে বসে পড়লেন।

আর ঠাকুরও ভাবাবেশে তাঁর কোলে বসলেন। অঘোরমণি সজল চোখে সঙ্গে-আনা খাবার তাঁর মুখে দিতে লাগলেন।

ঠাকুর ভাব সংবরণ করলেন খানিক পরে। কিন্তু অঘোরমণির ভাব আর থামে না। তিনি ঘরে নেচে নেচে বেড়াতে লাগলেন—'ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে শিব' বলতে বলতে।

একটি পরিচারিকা তখন সেই ঘরে কাজ করছিল। তার বিবৃতি পাওয়া যায় এ সম্পর্কে—আমি তখন ঠাকুরের ঘর ঝাঁটপাট করছি—বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। এমন সময় শুনতে পেলুম বাইরে কে 'গোপাল গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে আসছে। কাছে আসতে দেখি—গোপাল মা। তার ওই অবস্থা দেখে

আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি আড়ষ্ট। গোপাল মা ঠাকুরের কাছে এসে বসল। আর ঠাকুর তার কোলে ছেলের মত বসলেন। গোপাল মা তাঁকে খাইয়ে দিতে লাগল। যে ঠাকুর কখনো স্ত্রীলোক স্পর্শ করেননি —তাঁর একি! কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে ভাব কমল।' কিন্তু গোপাল মা ঘরে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল। কখনো বলে, 'ওই যে আমার গোপাল তোমার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন।' আবার কখনো—'বালক গোপাল ঠাকুরের দেহ থেকে বেরিয়ে আসছেন।'

ঠাকুর মুগ্ধ হলেন তাঁর এই অবস্থা দেখে। সবাইকে ডেকে দেখাতে লাগলেন এই অপূর্ব উপলব্ধির দৃশ্য।

'দেখ, দেখ কেমন আনন্দে ভরে গেছে—ওর মনটা এখন গোপাল লোকে চলে গেছে।'

আর অঘোরমণি ঠাকুরকে কত কথাই বলতে লাগলেন ভাবের ঘোরে—'এই যে গোপাল আমার কোলে। ঐ যে তোমার মধ্যে ঢুকে গেল। ঐ আবার বেরিয়ে এল।'

কখনো দু হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আয় বাবা, দুখিনী মার কাছে আয়।'

তিনি সমস্ত দিন গোপাল মাকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে দিলেন। তাঁর ভাবের উপশম করলেন অনেক চেষ্টা করে। শান্ত হবার পর তাঁকে আহার করালেন। সেদিন বিকালে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন কামারহাটিতে।

গোপাল এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকেই বালক গোপাল রূপে দেখালেন। কখনো ঠাকুরের অঙ্গে লীন হয়ে। কখনো নিজেই বাল্যলীলা প্রদর্শন করে।

সেদিন থেকে অঘোরমণি সত্যই হলেন 'গোপালের মা' বা 'গোপাল মা।' স্বয়ং ঠাকুর তাঁকে ওই নামে ডাকতে লাগলেন।

গোপাল সে রাতেও রইলেন অঘোরমণির কাছে। নানা রঙ্গ আর লীলাখেলা করলেন। বার বার ভঙ্গ করে দিলেন তাঁর জপ। পরের দিন সকালেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

তার কিছুদিন পরের কথা। গোপাল মা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। জপ করছেন নহবতের ঘরে বসে।

ওঠার সময় ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'তুমি এখনো এত জপ কর কেন? তোমার ত খুব হয়েছে।'

অঘোরমণি সাগ্রহে জানতে চাইলেন,'জপ করব না? আমার কি সব হয়েছে?'

ঠাকুর পরম আশ্বাস দিলেন, 'হ্যাঁ সব হয়েছে।'

সাধিকার আনন্দের সীমা রইল না। বললেন, 'বল কি, সব হয়েছে?'

ঠাকুর জানিয়ে দিলেন, 'হ্যাঁ, তোমার নিজের জন্যে সব হয়েছে। তবে (আপনার শরীর দেখিয়ে) এই দেহটা ভাল থাকবে বলে যদি ইচ্ছে হয় ত করতে পার।'

'তবে এখন থেকে যা কিছু করব সব তোমার, তোমার, তোমার

তারপর কুঁড়োজালি তিনি গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন।

অবিরাম দু'মাস অঘোরমণি ভেসে রইলেন বাৎসল্য রসে। ইষ্টকে নিত্য কাছে পেলেন। বাল গোপালকে কোলে পিঠে নিয়ে দিন যাপন করলেন। অতি অল্প ভাগ্যবানের পক্ষে এসব সম্ভব। চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম—এত দীর্ঘকাল এই অনুভব!

দু মাস পরে ক্রমে সে ভাব প্রশমিত হয়ে গেল। তবু অঘোরমণির

র্দগোপাল ন হত—একান্তচিত্তে খানিকক্ষণ চিন্তামগ্ন হলেই।

তারপর সেই উল্টোরথের দিন। ১৮৮৫ সাল। বলরাম মন্দিরে ঠাকুর রইলেন তু-রাত্রি। আর আনন্দের হাট বসিয়ে দিলেন।

জলযোগের সময় মেয়েদের শোনালেন গোপাল মা'র সৌভাগ্যের কথা। আর বললেন, 'তাকে এখানে আনাও না।'

শুনে, বলরাম তখনি লোক পাঠালেন।

কামারহাটি ত অল্প দূর নয় সেখান থেকে। লোক যাতায়াতে তুপূর, বিকাল গেল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। ঠাকুর দোতলার হল্ ঘরে রয়েছেন ভক্তসঙ্গে। ঈশ্বরীয় নানা কথা বল্‌ছেন। হঠাৎ বাল-গোপাল ভাব জেগে উঠল তাঁর। কথা বন্ধ। স্থির হয়ে গেলেন। বাল-গোপাল মূর্তির মতন মেঝেয় বসলেন হাঁটু পেতে। এক হাত ভূমিতে, হামা দেওয়ার ভঙ্গিমায়। অপর হাত তুলে একদৃষ্টে কার দিকে। প্রবল ভাব। বালগোপালের পটের মতন নিশ্চল অঙ্গ। আধ নিমীলিত চোখ।

ঠিক সে সময় গোপাল মা এসে দাঁড়ালেন। নিজের ইষ্টরূপে দর্শন করলেন ঠাকুরকে।

সকলে গোপাল মাকে সংবর্ধনা করলেন। তাঁরা বললেন, 'ঠাকুর গোপালরূপ ধারণ করেছেন তাঁরই ভক্তি প্রভাবে।'...

একদিন ঠাকুর বলেন গোপালমা কোথায়—'এ খোল্‌টার ভিতর কেবল হরিতে ভরা—হরিময় দেহ।'

আর একদিন গোপাল মা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঘরে যা ভাল ছিল ঠাকুর তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন।

গোপালের মা বললেন, 'গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে

ভালবাস কেন ?'

'তুমি যে আগে আমাকে কত 'খাইয়েছ !'

অঘোরমণি সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন, 'আগে কবে খাইয়েছি ?'

ঠাকুর জানালেন, 'জন্মান্তরে।'

গোপাল মা ফেরার সময়, ভক্তদের আনা সব মিছরি তাঁকে দিলেন। তিনি আপত্তি করলেন।

ঠাকুর সাদরে বললেন—(রূপকার্থে ?)—'ছিলে গুড়, হলে চিনি। তারপরে হলে মিছরি। এখন মিছরি খাও আর আনন্দ কর।'

অন্য একদিন অঘোরমণিকে বললেন, 'এইসব দর্শনের কথা নরেনকে বল।'

ঠাকুরের ইচ্ছা হয়েছিল, গোপাল মার দর্শনাদি সম্পর্কে নরেন্দ্রের মতামত শোনা। নরেন্দ্র এত বড় 'ইংলিশম্যান', এমন বুদ্ধিমান, এত ইংরেজী বিদ্যা,—তাঁর কি ধারণা এই গোপাল দর্শন সম্বন্ধে।

এর আগে, দর্শন যা কিছু হ'ত, অঘোরমণি ঠাকুরকে সমস্ত জানাতেন। তখন ঠাকুর একদিন বলেন, 'দর্শনের কথা কাউকে বলতে নেই, আমাকেও না। তাহলে আর দর্শন হয় না।'

এখন আবার নরেন্দ্রকে জানাতে বলছেন সেসব গুহ্য কথা। তাই অঘোরমণি বললেন, 'তাতে কিছু দোষ হবে না ত গো ?'

ঠাকুর আশ্বাস দিলেন, 'না, দোষ হবে না। নরেনকে বলে দেখ।'

গোপাল মা তখন সব জানালেন নরেন্দ্রকে। তারপর বললেন, 'বাবা, তোমরা পণ্ডিত। তোমাদের কত বুদ্ধি। আমি দুঃখী,···কিছু জানি না। তোমরা বল, আমার এসব ত মিথ্যে নয় ?'

নরেন্দ্র তন্ময় হয়ে শুনছিলেন অঘোরমণির বিবরণ। সাধিকার

রাগানুগা ভক্তি, বাৎসল্য রসের অপূর্ব ভাবাবস্থা। গোপালময় সত্তার দিব্য-দর্শন। শুনতে শুনতে নরেন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর চোখ।

তিনি বললেন, 'না মা, তুমি যা দেখেছ সব সত্য।'

ঠাকুর নরেন্দ্রকে জানাতে চেয়েছিলেন গোপাল মা'র দর্শনের কথা। শিষ্যের মত জেনেও নিশ্চয় তৃপ্তি পান।

সরল ভক্তিমার্গের নিষ্ঠাবতী সাধিকা অঘোরমণি। তাঁর সাত্ত্বিক আধার পূর্ণরূপে সার্থক হয় ঠাকুরের অলৌকিকী প্রভাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করবার পরও বিশ বছর জীবিত ছিলেন তিনি। বাল গোপাল-ময় হয়ে থাকেন। গোপাল সত্তা তাঁর ধ্যান জ্ঞানে অঙ্গাঙ্গী। গোপাল ভাবেন নিজেকেও। 'গোপাল খাবে', 'গোপাল শোবে', বলেন—'আমি খাব', 'আমি শোব' না বলে।'

উপসংহারে, তাঁর সম্পর্কে দু' একটি সংবাদ।

স্বামীজী পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করে ফিরে এসেছেন। তাঁর মুখে শ্রীমতী সারা বুল্, মিস ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা শোনেন গোপাল মা'র কথা। একদিন কামারহাটিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন অঘোরমণি তাঁদের যে আদর যত্ন করেন তাঁরা মুগ্ধ হয়ে তা জানান স্বামীজীকে।

তখন স্বামীজী বলেন, 'আহা, তোমরা প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শ দেখে এসেছ। উপাসনা ও অশ্রুবর্ষণ, উপবাস ও জাগরণ, ব্রহ্মচর্য ও তপশ্চর্যাময় ভারত বিদায় নিচ্ছে—আর সে ফিরবে না।'...

একবার স্বামীজী দুটি মহিলাকে মন্ত্র দিতে অনুরোধ করেন গোপালমা'কে। বিনয়বশত তিনি রাজি হচ্ছিলেন না। তখন স্বামীজী

বলেন, 'তুমি কি যে সে? তুমি জপে সিদ্ধ।···তোমার ইষ্টমন্ত্রটি দিয়ে দাও--তাতেই ওদের কাজ হবে।'

অঘোরমণি গোপাল মন্ত্রই দেন তাঁদের।

শরীরের শেষ দিকে ঠাকুরের শিষ্য সেবকরা তাঁকে কামারহাটি থেকে নিয়ে আসেন। তাঁর সেবা যত্নের ভার নেন স্বেচ্ছায়, শ্রদ্ধার সঙ্গে। মাঝে মাঝে তিনি বলরাম মন্দিরে থাকেন। কখনো মায়ের বাড়িতে, বাগবাজারে।

বলরামের গৃহ থেকে নিবেদিতা তাঁকে নিজের কাছে রাখেন শেষ হু বছর! গোপালমা'র তখন একেবারে বালিকা স্বভাব হয়েছিল।

তাঁর সম্বন্ধে নিবেদিতা এক বান্ধবীকে পত্র লেখেন (৯ ডিসেম্বর, ১৯০৩)—'গোপাল মার কাছে বসলে এক অদ্ভূৎ, উদ্দীপনা জাগে। ···গোপাল মা'র যে পরমহংস অবস্থা, এ আমি বিশ্বাস করি।'

তাঁর নিদানকালের বর্ণনাও আছে নিবেদিতার 'Studies from an Indian Home' রচনায়। তাঁর দীর্ঘ শ্বাসের ক্রিয়া লক্ষ্য করে নিবেদিতা লেখেন – 'বহু বছর প্রাণায়ামের ফলে এমন হওয়া সম্ভব।'

অন্তিম লগ্নে তাঁকে রাখা হয় গঙ্গাতীরে। কারণ গঙ্গাদর্শন তাঁর চিরপ্রিয় ছিল। নিবেদিতা নগ্ন পদে আসেন তাঁর সঙ্গে। শেষের হুদিন তাঁর পাশে ছিলেন। গোপালমা'র প্রয়াণ হল ৮ই জুলাই ১৯০৬ সালে।

যে জপমালায় অঘোরমণি বছরের পর বছর গোপাল-মন্ত্র জপ করেছিলেন সেটি নিবেদিতা নিজের কাছে রাখেন। আর তাঁর পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি আছে বেলুড়ে, মায়ের মন্দিরে।

তোতাপুরী ও গুরুশিষ্য সংবাদ

যত মত তত পথ। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি পরম উদার বাণী নয় শুধু। এ তাঁর উপলব্ধ সত্য।

নানা মতের সাধন-ক্রিয়ায় তিনি নিজে অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তিনি জন্মসিদ্ধ। পূর্ণজ্ঞানী। পুষ্পিত হওয়ার আগেই বিকশিত ফল। তবু বিভিন্ন পন্থার বিশেষত্ব জেনে নেন স্বয়ং। এক এক ভাবে সিদ্ধিলাভ। নানা সাধনক্রিয়ায় অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়ে যান। আর, যখন যে মার্গের ইচ্ছা বা প্রয়োজন হয় তার নির্দেশক বা সহায়কও পেয়েছেন দক্ষিণেশ্বরেই। সাধনার জন্যে অন্য কোন পীঠস্থানে তাঁকে যেতে হয়নি। আপন সাধনক্ষেত্র করেছেন এই কালিকা মন্দির চত্বরে, গঙ্গাতীরে, বাগানে, পঞ্চবটীতলে।

কয়েকজন উচ্চকোটির সাধক সাধিকা এজন্যে দেখা দেন দক্ষিণেশ্বরে। মন্দিরের অতিথিশালায় কত প্রকৃতির ও পন্থার সাধু সমাগম হত। তাঁরাও আকৃষ্ট হতেন ঠাকুরকে দেখে।

তন্ত্রসাধনার জন্যে যোগেশ্বরী ভৈরবী এলেন। তান্ত্রিক পদ্ধতির সাধন সব কিছু করালেন ক্রম পর্যায়ে।

মধুর ভাবের ভক্তি সাধনাতেও সে ব্রাহ্মণী সহায়তা করেছিলেন।

তন্ত্র মতের পরে ঠাকুরের বৈষ্ণব রীতির রামাৎ পর্ব। এবার তিনি জটাধারীকে পেলেন। বাৎসল্য রসের সাধক-প্রবর, ইনি বাল রামচন্দ্র মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁকে ত্যাগী ভক্তিমান নিষ্ঠাবান দেখে ঠাকুর আকৃষ্ট

হলেন এবং তাঁর কাছে বাল-রাম সাধনায় দীক্ষা নিলেন। জটাধারী তাঁর পূজিত রামলাল বিগ্রহটিও দিয়ে যান ঠাকুরকে।

তারপর তিনি যোগ সাধনার কথা ভাবছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির সত্তা যেখানে লুপ্ত হয়, সকল রূপ ও জ্যোতির পারে পরমাত্মায় লয় হওয়ার মর্ম জানতে এবার তাঁর আগ্রহ।

এমন সময় এলেন এক ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী। দক্ষিণেশ্বরে এমন সাধু ঠাকুর আগে দেখেননি।

যোগসিদ্ধ মহা তপস্বী তিনি। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী সাধক। সাধারণ্যে অপরিচিত। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সাধু সমাজে কেবল তাঁর নাম জানা— তোতাপুরী। তাঁকে কোন আশ্রমে স্থিত দেখা যায় না।

আদর্শ রম্‌তা সাধু তিনি। ক্রমাগত পরিভ্রমণ করেন তীর্থে তীর্থে। কোথাও তিন রাত্রির বেশি যাপন করেন না।

পশ্চিমাঞ্চল থেকে পরিক্রমায় তোতাপুরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। এখান থেকে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাবেন। মন্দিরের অতিথিশালায়ও তাঁর তিন দিনের অনধিক থাকার ইচ্ছা।

প্রথম দিনেই তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের সংযোগ ঘটল। আর তাঁর এক অনন্য ভূমিকা পালিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণর সাধন জীবনে। তোতাপুরীই তাঁকে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস দিলেন। তীব্র ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি হয়েও ঠাকুর বিধিবদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি এ যাবৎ। তোতাপুরীর উদ্‌যোগে শ্রাদ্ধাদি পূর্বক্রিয়া তাঁর যথারীতি সম্পন্ন হল।

ঠাকুরকে অদ্বৈত সাধনেও প্রবৃত্ত করালেন তিনি। সেই সূত্রে তোতাপুরী তাঁর গুরু স্থানীয়।

কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন তোতাপুরীর শিষ্য—এমন বিবৃতি সম্পূর্ণ

সঠিক কি ?

কিংবা তোতাপুরী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু—এমন বিবৃতি কি সঠিক বা সম্পূর্ণ সত্য ? ওকথা আংশিক সত্য বা সাময়িক বলা যায়। কারণ উক্ত যোগী তাঁকে একটি বিশেষ মতের—অদ্বৈত সাধনার বা ব্রহ্মবাদের দিশারী। (যেমন যোগীশ্বরী ভৈরবী তাঁকে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধন করিয়েছিলেন)। কিন্তু তিনি ত কেবল ভাবাতীত গুণাতীত ব্রহ্মের উপাসক নন। শুধু ব্রহ্মবাদী বললে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। তিনি ঈশ্বর-দ্রষ্টা। নানাভাবে পরমাত্মার আরাধনায় ব্রতী। তিনি পূর্ণজ্ঞানী। আবার অধ্যাত্ম সাধনে বৈচিত্র বিলাসী। রস-স্বরূপ ঈশ্বরকে তিনি আস্বাদ করেন, উপলব্ধি করেন বহুভাবে। বিভিন্ন মার্গে তাঁর গতিবিধি ঈশ্বরীয় সঙ্গ লাভে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সর্বভাবে তাঁর ভগবদ্ সান্নিধ্য। এই বিচিত্র পথে ঈশ্বরীয় আস্বাদনই তাঁর—নিজের ভাষায়—'বিলাস' করা। তোতাপুরী তার একটিমাত্র ভাবের উদ্বোধক।

তা ভিন্ন, আরো কথা আছে এ প্রসঙ্গে। অধ্যাত্মমার্গী, সাধকদের মধ্যে তুলনা করা অসমীচীন। তাঁরা লোকোত্তর পুরুষ। আপন আপন সাধন ও সিদ্ধিতে বিশিষ্ট। নিজেদের মহিমায়, ভাস্বর। তোতাপুরী এক মহাযোগী, সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মসিদ্ধ। তাঁর উপরন্তু ভূমিকা হ'ল যুগাচার্যের। তাঁকে কেন্দ্র করে নরজাগৃতির ঐতিহাসিক পর্ব উদ্যাপিত হয় ধর্মক্ষেত্রে। তিনি সচেতন প্রয়াসে বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন করে যান। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে নিয়ামকের ভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব। তবে যে প্রসঙ্গ বর্তমান নিবন্ধে নিঃসম্পর্কিত। এখানে বর্ণনীয়, তোতাপুরীর সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের

যোগ বিভূতি অথবা তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুরের অতিলৌকিক প্রসঙ্গ। তার পটভূমিতে তোতাপুরীর বাহ্য-জীবন প্রসঙ্গ আলোচনা করে নেয়া যায়।

তোতাপুরী ১৮৬১।৬২ সালে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। ঠাকুর তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী। আর ভোগপুরীর বয়স জানা যায়নি এবং সঠিক জানার উপায়ও নেই। তাঁর জীবন ও সাধনের অনেকাংশই অজ্ঞাত। ভারতের স্বনামধন্য সাধকদের মধ্যে তোতাপুরীর বিবরণ বিশেষ উদ্ধার হয়নি। 'পুরী' সম্প্রদায়ের সূত্র ভিন্ন তার সাধন-জীবন বা গুরুকরণ সম্পর্কেও তথ্যাদি অপ্রাপ্য। তাঁর পূর্বাশ্রমও সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত। তাঁর পাঞ্জাবী শরীর, এইমাত্র জানা গেছে।

তোতাপুরীর আয়ু সম্পর্কে এই ধারণা হয় যে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ-জীবী ছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের সন সঠিক পাওয়া যায়—১৯৬১ সালের ১৪ই আগস্ট। অর্থাৎ তাঁর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগের পূর্ণ একশ বছর পরে।

কিন্তু তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আসার সময় বয়স জানা যায়নি বলেই তাঁর বয়স বিষয়ে সমস্যা। তখন তিনি প্রবীণ ছিলেন এইমাত্র কথিত আছে। আরো উক্ত হয়েছে যে তার আগে তিনি চল্লিশ বছর অদ্বৈত সাধনা করে-ছিলেন। সুতরাং তাঁর তখনকার বয়স যাট (বা সত্তর) ধর্তব্য, যদি বিশ (বা ত্রিশ) বছর বয়সে তাঁর সাধন-জীবনের সূত্রপাত হয়ে থাকে। এই হিসাবে তোতাপুরী দেহান্তকালে অন্তত একশ যাট বা (একশ সত্তর) বয়সী হয়েছিলেন। সুতরাং অসাধারণ পরমায়ু। শুধু তাই নয়-অপর মতে তাঁর আয়ু ছিল তিনশ বছর। এটি অসম্ভব কিনা বলা চলে না। কারণ এই ধরনের মহাযোগী সম্পর্কে বাইরে থেকে ধারণা করা যায় না।

কাশীতে তিন শতকের আয়ু নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। তোতাপুরীর শেষোক্ত বয়স ধার্য হলে, তিনি দু'শ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে আসেন, এই অনুমান করতে হয়।

দক্ষিণেশ্বর পর্যায়ের পরে তিনি চলে যান পশ্চিমাঞ্চলে। তখন থেকে তাঁর ষাট বছরের জীবনকথা কিছু জানা যায়নি। কিন্তু তার পরবর্তী চল্লিশ বছরের কথা প্রকাশ পেয়েছে অনেকখানি। তা-ই তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছর। সেসময় তিনি অধিকাংশই পুরীতে থাকেন। তাঁর দেহত্যাগও হয় শ্রীক্ষেত্রে। সেই চল্লিশ বছরের মাঝে মাঝে তিনি পুরীর বাইরেও যেতেন বটে কিন্তু প্রধানত এখানেই অবস্থান করেন।

এই পর্বে, পুরুষোত্তমে, তোতাপুরীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় সাধারণ্যে। আর তা প্রায় সাম্প্রতিক কালের কথা। বর্তমান শতকের বিশের দশক থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত। সেজন্যে তাঁর মহিমা ওড়িশায় ওই অঞ্চলে লোক-মুখে যথেষ্ট প্রচারিত হয়ে যায়।

পুরীতে তিনি সাধন-পীঠ করেন গীর্ণারিবন্ত টিলায়। সেই বালিয়াড়িতে তাঁর নিয়মিত দর্শন লাভে অনেকে ধন্য হয়। তিনি কৃপা করেন নানা ভাগ্যবানকে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাঁর যোগ বিভূতিও প্রকাশ পায়। তিনি দৃষ্টি দেন দৃষ্টিহারাকে। আশাহীন মৃতপ্রায় দেহে তিনি প্রাণ সঞ্চার করেন। বিশাল শরীর নিয়ে তোতাপুরী বিরাট পুরুষ রূপে অবস্থান করেন অধ্যাত্মরাজ্যে। নির্বিকার পরমহংসরূপে তাঁকে এই পর্বে সকলে দেখে। তপ্ত বালুকায় তিনি কতদিন শয়ন করে থেকেছেন। দ্বিপ্রহরের সমুদ্রতীরে, নগ্নশরীরে। এখানে লোকে তাঁকে তোতাপুরী নামে জানেনি। তিনি কথিত হতেন—'নাঙ্গা বাবা।' কারণ সর্বদা দিগম্বর।

এখানে প্রথম অর্ধ শতাব্দ যে ছিলেন তখন তাঁর দেহকে একই প্রকার

দেখা যায়। সুস্থ, সবল, অতিকায়। মুখ বা অন্য কোন অঙ্গে বলিরেখা হীন। শেষ পর্যন্তও জরাগ্রস্ত হননি, বয়স যদিও একশ ষাট সত্তর বছর (মতান্তরে তিনশ বছর)। তাঁর ব্যক্তি প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানা গেছে। তিনি কেবল হিন্দীভাষী ছিলেন না। তামিল, তেলেগু ও মালায়লাম ভাষাও বলতেন দক্ষিণীদের সঙ্গে।

সেই গীর্ণারিবস্ত পাহাড়ে তাঁর দেহত্যাগও হয় ও সমাধিও আছে। তাঁর এই সাধনপীঠে স্থাপিত হয়েছে শুভ্র, সুন্দর, সমুচ্চ স্মৃতি-মন্দির। সেখানে তাঁর একটি প্রমাণ আকারের প্রতিকৃতিও দ্রষ্টব্য। বর্তমান পুরীর এক পুণ্য তীর্থস্থান। মহাযোগী তোতাপুরীর সমাধিস্থল—যা 'নাঙ্গা বাবার আশ্রম' নামে স্থানীয়ভাবে সুপরিচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে 'নেংটা' নামে উল্লেখ করেছেন। একাধিকবার তা পাওয়া গেছে 'কথামৃত'তে।

তাঁদের সেই যুক্ত প্রসঙ্গ ১৮৬১।৬২ সালের কথা। তোতাপুরীর গীর্ণারিবস্ত পাহাড়ে অবস্থানের একশ বছর আগে!

যুবক গদাধরের তখন বিভিন্ন মতে সাধন পর্যায়ের কাল। তান্ত্রিক পদ্ধতির পরে রামাৎ সাধনাও হয়েছে। এখন তিনি ভাবছেন যোগ-সাধনের কথা।

এমন সময় এক রম্‌তা সাধু দক্ষিণেশ্বরে এলেন। মধ্যভারত থেকে পরিক্রমণ করতে করতে তিনি এই কালীমন্দিরে উপস্থিত, কলকাতার উপকণ্ঠে। তার আগে নর্মদাতীরে বহুকাল একান্ত সাধন-মগ্ন থেকেছেন। নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেছেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন তিন দিনের জন্যে। এখান থেকে সাগর সঙ্গমে অর্থাৎ গঙ্গাসাগর তীর্থে যাবেন। তারপর শ্রীক্ষেত্রে যাবার ইচ্ছা।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের অতিথিশালায় তাঁর প্রথম দেখা হ'ল ঠাকুরের সঙ্গে। যেদিন তোতাপুরী এখানে আসেন সেদিনই এই সাক্ষাৎকার ঘটে। আর দুজনেই আকৃষ্ট হন পরস্পরের প্রতি।

কিন্তু তার আগেও একবার ঠাকুর তাঁকে 'দেখেছিলেন।' দক্ষিণেশ্বরেই। ওই পারস্পরিক সাক্ষাতের অব্যবহিত আগে। কিন্তু সে চর্মচক্ষে বা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা নয়। এ ব্যাপারেও প্রকাশ পায় শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক রহস্য। তাঁর সেই দর্শন দিব্য আবেশে।

তিনি তখন ভবতারিণী কালী প্রতিমার সামনে ছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুখ করে তিনি বসে। গঙ্গা পশ্চিমে বা তাঁর পিছন দিকে। কিন্তু তুরীয় কিংবা আরো ঊর্ধভূমিতে তখন তাঁর চেতনার অবস্থান। অতিলৌকিক জ্যোতির্ময় পথে প্রসারিত দৃষ্টি। তিনি 'দেখলেন'—এক সাধু গঙ্গায় নেমে এসে স্নান করছেন। প্রবীণ বয়সী সন্ত। তাঁর তপঃসিদ্ধ যোগীর শরীর। সর্বাঙ্গ বিভাময়। শিরে জটাজুটধারী। কিন্তু কৌপীন মাত্রও নেই, সম্পূর্ণ দিগম্বর। তাঁর নামও জানলেন—তোতাপুরী।

পরে দুজনের বাহ্য মিলন হল মন্দিরের অতিথিসদনে। তোতাকে দেখে ঠাকুর পুলকিত হলেন। নিজেও তেমনি আকর্ষণ করলেন আগন্তুক সাধককে।

দিব্য তনু তরুণকে দেখে যোগিবর তৃপ্তি পেলেন—উত্তম আধার। সে অঙ্গে তাঁর ঈপ্সিত শরীর লীলা দেখে পরিচয় জানতে ইচ্ছা হল। এমন অভিলাষিত মূর্তি। শিষ্য করার যোগ্য।

তিনি প্রস্তাব করলেন, 'কেয়া বাচ্ছা, কুছ সাধন করেগা ?'

নতুন কোন সাধনার পর্যায় ? ঈশ্বর লাভের আর এক উপায় সন্ধান ! ইচ্ছা, উৎসাহ, একমনা নিষ্ঠা সবই গদাধরের আছে এ ব্যাপারে।

কিন্তু অপরের নির্দেশে নতুন কিছু সাধন ভজনের ক্রিয়া ?

নিজে থেকে কথা দেবেন না। 'মা'য়ের মত নিতে হবে। তাঁর'জননী' —চিন্ময়ী কালী। তিনি সম্মতি দিলে তবেই গদাধরের সাধন সম্ভব হবে। মা যা বলবেন। সদা যোগ তাঁর জগজ্জননীর সঙ্গে। তাঁর অজ্ঞাতে বা অমতে কিছু নয় কখনো।

তোতাকে জানালেন, 'তা আমি এখনই বলতে পারছি না। আগে মার কাছে তাঁর মতামত নিতে হবে। তারপর বল্‌বো।'

যোগী বিস্মিত। 'মাকে জিজ্ঞাসা ?' কে জননী—জানতে কৌতূহল জাগে।

বালকের সরল ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে গদাধর মন্দিরে গেলেন। দেবীকে জানালেন নতুন বার্তা—'মাগো, যোগীর মতে এই সাধনা করব কি ?'

ভাবের অতীত, রূপলোকের অতীত এই অদ্বৈত সাধন।

তাঁর চিন্ময়ী মা সম্মতি দিলেন। গদাধর আরো জানলেন—সাধন-পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন এই মহা সাধক। ইনিই তোতাপুরী।

সন্ন্যাসী স্তম্ভিত। এখানে 'বাচ্ছা' কেমন করে আমার নাম জানলে ? তীর্থে তীর্থে ক্রমাগত ভ্রমণ করে বেড়াই। তিন দিনের বেশি কোথাও থাকি না। এ অঞ্চলে কারো সঙ্গে আমার জানাশোনা নেই। এ কি আশ্চর্য !

গদাধর জানালেন, 'মার আদেশ পেয়েছি। আমি তোমার কাছে সাধনা করব।'

শুনে তোতা সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'আমি তিন দিন এখানে থাকব। তারপর অন্য তীর্থে চলে যাব।'

কথায় কথায় তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন গদাধর। দিবারাত্রি অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ হতে লাগল দুজনের মধ্যে। সাধনার্থী আহার নিদ্রা ভুলে গেলেন —অরূপ সাধন কথায় এমন ভাবে বিভোর।

এমন একাগ্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুকে পেয়ে যোগিবরও প্রীত হলেন। তাঁর মনেই রইল না তীর্থান্তরে যাত্রার কথা। অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনের প্রসঙ্গে, অরূপের আলোচনায় নিরত রইলেন।

শুধু তত্ত্বজ্ঞান নয়। আরম্ভ হল সাধনক্রিয়া। তার জন্যে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের কথাও তোতাপুরী জানালেন। নিয়ম পূর্বক সন্ন্যাস নেয়া আবশ্যিক।

গদাধর সম্মত হলেন। কিন্তু সন্ন্যাস নেবেন গোপনে। কারণ মায়ের মনে কষ্ট দিতে চান না। মা যেন জানতে না পারেন। তিনি এখন দক্ষিণেশ্বরেই আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে তিনি কাতরা। তার ওপর গদায়ের সন্ন্যাস সহ্য হবে না তাঁর। তিনি বড়ই ব্যথা পাবেন। মাতৃভক্ত গদাধর একথা জানালেন তোতাপুরীকে। যোগিবর তাঁর যুক্তি শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং গোপনতার ব্যাপারে মত দিলেন।

শ্রদ্ধাদি পূর্বক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন করে ঠাকুর আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস নিলেন তোতাপুরীর কাছেই। তাঁর অঙ্গের সুলক্ষণ দেখে গুরু মুগ্ধ হলেন। সাধনের বিধি নির্দেশাদি দিলেন দীক্ষান্তে। এবার নামের রাজ্য, রূপের রাজ্য থেকে মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে—যেখানে ব্রহ্মের বিহার। গুরুর এই উপদেশ।

শিষ্যও প্রয়াস করলেন, আসনস্থ হয়ে। কিন্তু তিনি প্রকৃতিতে ভাবের ভাবুক। ভাবরাজ্যে নিবাসী। ভাবময়ী জগজ্জননীর সেবক। তাঁর চরণ ছেড়ে ভাবের অতীত, গুণের অতীত ব্রহ্মে স্থিত হতে

পারছিলেন না। একাধিকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কিন্তু গুরু তৎপর করতে চাইলেন তাঁকে। তখনি অদ্বৈতভাবে সমাধিস্থ করতে বদ্ধপরিকর।

শিষ্যকে তিনি প্রেরণা দিতে লাগলেন। 'নেতি নেতি' উপায়ে অবস্থান করতে বললেন। ব্রহ্মা স্বরূপে। একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই সত্য, নিত্য। মনকে নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মগ্ন হতে নির্দেশ দিলেন।

ঠাকুরও সচেষ্ট হলেন যথাসাধ্য। অন্য সব বিষয় থেকে মন বিচ্ছিন্ন হল। কিন্তু কিছুতেই জাগল না শূণ্যতার বোধ। পরমেশ্বরী জগন্মাতার চিদ্‌ঘন মূর্তি তাঁর ধ্যান মননে জীবন্ত হয়ে রইল। ব্যর্থ করে দিতে লাগল নাম রূপ ত্যাগের প্রয়াসকে।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তিনি হতাশ হলেন। গুরুকে জানালেন, 'হল না।'

তোতা গর্জন করে উঠলেন—হতেই হবে। উত্তেজিত হয়ে একটি কাঁচের টুকরো কুড়িয়ে নিলেন। তাঁর সেটি শিষ্যের দুই ভ্রূর মধ্যে বিঁধে দিয়ে বললেন, 'এই বিন্দুতে মন গুটিয়ে আনো।'

এবার ঠাকুর ধ্যানে বসলেন দৃঢ় সংকল্প করে। জগদম্বার শ্রীমূর্তি চিত্তপটে উদিত হতেই জ্ঞানকে অসি কল্পনা করলেন। তাই দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন সে বিগ্রহ। তখন আর বিকল্প কোন রূপ মনে রইল না। এবার অবাধে নামরূপ রাজ্য পার হয়ে সমাধিমগ্ন হলেন। ব্রহ্মে মিলিত হয়ে রইলেন।

দেখে পরিতৃপ্ত হলেন তোতাপুরী। নির্বিকল্প সমাধির সব লক্ষণ স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন শিষ্যের অঙ্গে। কিন্তু তবু তাঁর মনে সন্দেহ জাগল। এও কি সম্ভব ? চল্লিশ বছরের একাগ্র সাধনায় তাঁর যে সিদ্ধি লাভ হয়,

এই যুবকের তা ঘটল প্রথম দিনেই।

ব্রহ্মবিদ পুনরায় তাঁকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোন বৈলক্ষণ্য পেলেন না। লক্ষণাদি সব যথাযথ। তখন তিনি অর্গলবদ্ধ করলেন সে ঘর। আর দ্বারে প্রহরী হয়ে রইলেন। দেখতে চান, কতক্ষণ থাকে এমন নির্বিকল্প অবস্থা।

একদিন, দুদিন ক্রমে, তিনদিনও গেল। তরুণ সাধক নিঃসাড়ে কাষ্ঠবৎ বসে। ভিতরের বায়ুগতি রূদ্ধ। যেন প্রাণহীন জড়। অচল অটল পূর্ববৎ। কিন্তু মুখ জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল।

তোতা প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। তারপর চীৎকার করে উঠলেন আনন্দে, 'য়হ্ ক্যা দৈবী মায়া!'

কিন্তু আরও সমাধিস্থ থাকা তিনি সমীচীন বোধ করলেন না। সমাধিভঙ্গ করতে লাগলেন যথাবিধি প্রক্রিয়ায়। গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে বার বার 'হরি ওম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। সেই ধ্বনিতে মন্দির চত্বরের আকাশ বাতাস রণিত হয়ে উঠল। অবশেষে সমাধি ভাঙল তাঁর।

বিনা সাধনায় ও প্রস্তুতিতে এমন নির্বিকল্প সমাধি! এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল তোতাপুরীর অভিজ্ঞতায়। বুদ্ধিতে এর বিচার অসাধ্য।

শিষ্যের যোগ-মুগ্ধ হয়ে তিনি রয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। কোথায় তাঁর তিন রাত্রির রম্‌তা জীবন। এখানে তাঁর মাসের পর মাস পার হয়ে গেল। একাদিক্রমে এগার মাস তিনি বাস করলেন, ঠাকুরের অধ্যাত্ম-সঙ্গে। তারপর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করলেন।

কিন্তু তার আগে অবতারণা হল আর একটি অলৌকিক রহস্য। তোতাপুরীর উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবী শক্তি।

ঠাকুরের আকর্ষণে এখানে অবস্থান করলেও যোগিবর তাঁর সব ঈশ্বরীয় ভাবের সমর্থক ছিলেন না। ঠাকুর যে শ্যামাকে মা বলতেন, শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তোতা এসব মনে করতেন ভ্রান্তি। কখনো প্রতিবাদ জানাতেন। কখনো বা হাসতেন। ব্যঙ্গের মন্তব্যও করতেন ভক্তিভাবের কোন কোন প্রকাশে। শক্তির বিষয়ে ঠাকুর যত বলতেন, অদ্বৈত বেদান্তী সব উড়িয়ে দিতেন 'মায়া' বলে।

কিন্তু শক্তির লীলা ঠাকুর একদিন তাঁকেই দেখালেন। তা তাঁর নিজেরই এক বিভূতি।

তোতাপুরী অতি পীড়িত হয়ে পড়লেন একবার। উৎকট রক্ত আমাশয়। রোগ কিছুতেই সারে না। তিনি যেমন কাতর হলেন উদরের যন্ত্রণায়, তেমনি শীর্ণ হয়ে গেল দেহ। কষ্টে অধীর হয়ে শেষে স্থির করলেন, এ শরীর আর রাখবেন না। এই গঙ্গার জলেই দেহত্যাগ করবেন। এই ভেবে নামলেন জলে।

ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন।

তোতাপুরী নিমজ্জনের জন্য গভীর জলে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। জল তাঁর জানুর ওপর উঠল না কোথাও। ডুব দেবার মতন জল তিনি পেলেন না। ফিরে এলেন নিরাশ হয়ে।

কিন্তু রোগ-যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল। তখন তাঁর মনে পড়ল শিষ্যের কথা। কেমন বিশ্বাস হল। নিরুপায়ে তিনি এলেন ঠাকুরের কাছে। তাঁকে মিনতি করে বললেন, 'কেমন করে আরোগ্য লাভ করি, বল।'

তিনি জানালেন, 'শ্যামা মাকে প্রণাম কর,তাঁর কাছে নিরাময় হবার প্রার্থনা কর, তাহলে হবে।'

যোগিবর তখনি ভবতারিণী মন্দিরে গেলেন। হাত-জোড় করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন দেবীকে।

মন্দির থেকে ফিরে আসার পরই তাঁর যন্ত্রণা দূর হল। বুঝতে পারলেন, ব্যাধি আর নেই।

সেদিন থেকে তাঁর বিশ্বাস হল শক্তিতে। তিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করলেন। বুঝলেন, যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। যাঁর শক্তি তাঁরই লীলা। যিনি নিরাকার তিনিই বিরাট ও অখণ্ড, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।

তাঁর এই বোধের সহায়ক হ'ল, শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি।

নরেন্দ্র প্রমুখের কাছে দৈবীপ্রকাশ

কত উপলক্ষ্যে, কত ভাবেই যে ঠাকুরের বিভূতি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সব সময় যে অসামান্য ঘটনায়, তাও নয়। কখনো এমন সামান্য অবস্থার মধ্যে তা দেখা যায় যে অনেকের লক্ষ্য পড়ে না। যেমন হল কাশীপুর বাগানবাড়িতে একদিন।

তখন তাঁর গলক্ষততে শরীরের প্রায় শেষ দশা। নীচে নামেন না। অক্ষয়কুমার সেন জানিয়েছেন তার বিবরণ—

'ঠাকুর দ্বিতলে যে ঘরে আছেন তার সকল দরজা জানলা বন্ধ। যেখানে তাঁর শয্যা সেটি অতি নিভৃত স্থান। এখানে মানুষ থাকলে বাগানের নীচে মধ্যে কে আসছে যাচ্ছে কিছুই জানা যায় না। ভক্ত-বৎসল ঠাকুর জানতে পেরেছেন যে, প্রবোধ ও পাঠক দর্শনের জন্যে এসেছে, আর তাদের বড় ক্ষুধা পেয়েছে। অমনি ঠাকুর একজন সেবককে বললেন, 'দেখ্, যে দুটি লোক এইমাত্র নীচে এল, তাদের শীঘ্র ডেকে

নিয়ে আয়।' সেবক আজ্ঞামত সেই ভাগ্যবান দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের ঘরের দরজায় প্রবেশ করতে না করতে ঠাকুর তাদের ঘন ঘন হাত বাড়িয়ে ডেকে বললেন, 'আয় আয়, আমি তোদের জন্য খাবার নিয়ে বসে রয়েছি। তোদের বড় খিদে পেয়েছে, খা খা।' উভয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর চরণ রেণু নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে মহাপ্রসাদ উদর পূর্ণ করে খেতে লাগলেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা, পৃঃ ৯)।

ঠাকুরের যোগৈশ্বর্য তাঁর শিষ্যদের কাছেও প্রকাশ পেয়েছে নানা-ভাবে। কখনো ঘটনাক্রমে। কখনো বা তিনি স্বয়ং লীলাভাবে দেখিয়েছেন। নিত্য সিদ্ধ, মুক্তমনা তাঁর সেই কিশোর তরুণ শিষ্যরা। যাঁদের তিনি উপমিত করেছেন হোমা পাখির সঙ্গে—যারা জন্ম থেকেই আকাশচারী, যারা মাটির পৃথিবীকে কখনো স্পর্শ করেনা। সেই কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী, আজন্ম বৈরাগী চিহ্নিত শিষ্যরা। গুরুর প্রাণ-প্রিয়, উত্তর সাধক। তাঁদের সাধনার প্রস্তুতি, অধ্যাত্মজীবন গঠন সবই তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে, নির্দেশে। আর তাঁদের অধ্যাত্মিক প্রয়োজনে ঠাকুর কখনো কখনো দৈবী শক্তি প্রয়োগ করেছেন।

চিহ্নিত শিষ্যরা ঠাকুরের বড় অন্তরঙ্গ। তাই ঘনিষ্ঠ সূত্রে তাঁর যোগৈশ্বর্যের পরিচয় পেয়েছেন প্রায় সকলেই। বিশেষ তাঁর কর-স্পর্শের দিব্য প্রভাব, তাঁদের জিহ্বায় তাঁর স্বহস্তে বীজমন্ত্র লিখন, উত্তরাধিকার স্বরূপ তাঁরা লাভ করেছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ আধার ও সর্বাধিক প্রিয় নরেন্দ্র তাঁর বিভূতি দেখেছেন সব চেয়ে বেশি। এই অধ্যায়ে নরেন্দ্র প্রসঙ্গ শেষে বর্ণনা করা হবে। তার আগে উল্লেখ করা যায় তাঁর কোন কোন শিষ্য ও শিষ্যোপম ভক্তদের কথা। শিষ্য গঙ্গাধর, যোগীন্দ্রনাথ ও

কালীপ্রসাদ, ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, অক্ষয়কুমার সেন প্রমুখের অভিজ্ঞতা। কেউ তাঁর সাক্ষাৎ প্রভাবেই অলৌকিক দর্শন করেছেন। কাউকে তিনি তুরীয় লোকের সন্ধান দিয়েছেন, ভাবান্তর ঘটিয়েছেন দিব্য পরশের মাধ্যমে।

প্রথমে গঙ্গাধর মহারাজের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একদিন তিনি ঠাকুরের ভাবে কেমন ভাবিত হন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে বিগ্রহকে অনুভব করেন চৈতন্যময় রূপে। গঙ্গাধর মহারাজ পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে অতি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ত্যাগপরায়ণ সেবা-কাজের জন্যে। সারগাছি আশ্রমের স্থাপক পরিচালক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় সভাপতি-রূপে তিনি সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে তিনি কিশোর বয়সেই উপনীত হন। তখনকার একদিনের কথা, দক্ষিণেশ্বরে। এটি বিবৃত করেছেন তাঁর জীবনীরচয়িতা, শিষ্য স্বামী অন্নদানন্দ—'আর একদিন গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে রহিয়াছে, পরদিন সকালে অন্তর্যামী ঠাকুর সস্নেহে তাহাকে একেবারে ভবতারিণীর মন্দিরের ভিতর লইয়া গিয়া বলিতেছেন, 'এই ছ্যাখ, চৈতন্য-ময় শিব।' বালকের অমনি মনে হইল, যেন চৈতন্যময় নিঃশ্বাস ফেলি-তেছেন! ঠাকুর বলিতেছেন, 'ছ্যাখ ছ্যাখ, এই চৈতন্যময় শিব কি করে শুয়ে আছেন!' এ দিনের প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন, 'এতদিন ভাবতাম যে, সব জায়গায় যেমন শিব, এও তেমনি। কিন্তু একি। এ যে জীবন্ত দর্শন করছি। সে যে কী আনন্দ ঠাকুর প্রাণে ঢেলে দিলেন, তা মুখে আর কি বলব। অনুভূতির বিষয়।·····

আমাকে যে কী দেখাচ্ছেন ঠাকুর—এই ভাবতে ভাবতে দিনটা যে কোন দিক দিয়ে গেল, তা জানতেও পারলাম না।······' (স্বামী

অখণ্ডানন্দ পৃঃ ১৭)।

ঠাকুরের আর একজন চিহ্নিত শিষ্য কালীপ্রসাদ। পরে স্বামী অভেদানন্দ নামে সুপ্রসিদ্ধ। স্বামীজীর আহ্বানে তিনি আমেরিকায় যান বেদান্ত প্রচারে। সেখানে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর সার্থকভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সুপণ্ডিত দার্শনিক, বাগ্মী, লেখক রূপে স্বামী অভেদানন্দ বিশেষ সম্মানিত। মার্কিন প্রবাসের পরে কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং বিবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণেতা। ঠাকুরের কাছে তিনিও অতি তরুণ বয়সেই আসেন যোগ শিক্ষার্থী হয়ে। গুরুর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনের কথা। ঠাকুর কালীপ্রসাদকে আপন কক্ষের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁকে সস্নেহে বসালেন একটি তক্তাপোষে—যোগাসনে। তারপর ঠাকুরের কথায় তিনি জিহ্বা বার করলেন। তাতে ঠাকুর একটি মূল মন্ত্র লিখে দিলেন মধ্যম আঙুল দিয়ে। তখনি আরো শক্তি সঞ্চার করলেন। শিষ্যের বুকে ডান হাত দিয়ে টানলেন ওপর দিকে। তাঁকে মা কালীর ধ্যান করতে বললেন। শিষ্য ধ্যান করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলেন গভীর থেকে আরো গভীরে। ক্রমে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা। আর অন্তরে অপূর্ব পুলকের অনুভব হল। কতক্ষণ গেল এইভাবে। পরে গুরু তাঁর বুকে হাত দিয়ে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নীচের দিকে নামিয়ে আনলেন। তখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল কালীপ্রসাদের। তখন এক অভূতপূর্ব নির্মল আনন্দ-স্রোতে পরিপূর্ণ হলেন। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) রামলাল ও গোলাপ মা। তাঁরা পরে কালীপ্রসাদকে বলেছিলেন, 'কি আশ্চর্য, ঠাকুর তোমায় ছোঁয়া মাত্র তুমি কাঠের মতন শক্ত হয়ে গিয়েছিলে।'

ঠাকুরের এই স্পর্শ করে দেবার ব্যাপারটি পাওয়া যায় নানাভাবে,

নানা পাত্রের ক্ষেত্রে। এমনিভাবে ছুঁয়ে দিয়ে তিনি কেবল শক্তিসঞ্চার করতেন না। কখনো কখনো শক্তি হরণও করেছেন। তা থেকেই ধারণা করা যায় কি দিব্য চৈতন্যে স্পৃষ্ট ছিল ঠাকুরের যোগসিদ্ধ শরীর। কালীপ্রসাদকে যেমন, তেমনি নরেন্দ্রকেও তিনি বিভিন্ন দিনে এমনি স্পর্শ করেছেন শক্তি জাগ্রত করতে। আরো অনেককে তেমনি করেন কল্পতরু দিবসে। এ ধরণের উদাহরণ আরো আছে এবং তা পরে বিবৃত হবে। আবার বিপরীত ভাবের দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন এ বিষয়েই। অর্থাৎ ছোঁয়ার ফলে এক অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটানো—কারো শক্তি নিস্তেজ করে দেওয়া !

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষদর্শী জীবনীকার, তথ্যবিদ অক্ষয়কুমার সেন এ সম্পর্কে জানিয়েছেন, কোন কোন বাক্যবাগীশের প্রসঙ্গে—'সেই তার্কিককে ছুঁয়ে দিয়ে বলতেন, কই তুমি কি বলছিলে, বল দেখি। এই ছুঁয়ে দেওয়াটিই করুণানিধির অপার করুণা। প্রভুদের স্পর্শে তার্কিক পণ্ডিতেরা কেমন হয়ে যেতেন—সেটা কেমন জানো ? সর্প-বিদ্যাবিদ্ সাপুড়ে ছড়ি হাতে করে উদ্যত ফণা সাপকে ধরলে সাপটি যেমন হয় পণ্ডিতদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হত।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা পৃঃ ১৩২)।

কল্পতরু দিবসে ঠাকুর অপার্থিব আনন্দ দিয়েছেন অনেককে। গা ছুঁয়ে দিয়ে অনাস্বাদিত ভাবের আস্বাদ বিতরণ করেছেন। সেদিন ঈশ্বরীর ভাবের আবেগ যাদের হয়েছে, যাঁরা অভিভূত হয়েছেন তাঁরা কেহই তাঁর শিষ্য নন। তবে বিশিষ্ট এবং তাঁর প্রিয় গৃহী ভক্ত সেই কৃপাপ্রাপ্তরা। যথা—নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুজ অতুলকৃষ্ণ, রামচন্দ্র দত্ত, নবগোপাল ঘোষ, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, হরমোহন মিত্র,

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, অক্ষয়কুমার সেন, কিশোরী রায়, হারাণচন্দ্র দাস প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার সেন এবং বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের বিবৃতি আছে, ঠাকুরের ছুঁয়ে দিয়ে আলোড়ন জাগানো সম্পর্কে।

অক্ষয়কুমার জানিয়েছেন যে উপেন্দ্রনাথ মজুমদার নামে একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি সেখানে ছিলেন। তিনি গৌর-বর্ণ হয়ে যান ঠাকুর ছুঁয়ে দেবার ফলে—'উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন। লোহার তাঁহার তনু করিলা কাঞ্চন।' তখনকার নিজের কথা অক্ষয়কুমার 'পুঁথিতে লিখেছেন—

পরে প্রভু ফিরিলেন ভবনের পথে।
দাঁড়িয়ে আছিনু মুই অনেক তফাতে॥
দূরে থেকে সম্ভোধিয়া কিগো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিলা বক্ষের উপরে॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার॥

সেদিন বৈকুণ্ঠনাথের প্রসঙ্গে পূর্বাপর আরো বিস্তারিতভাবে আছে ঠাকুরের যোগৈশ্বর্য :—

ঠাকুর লীলাভরে গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যে সকলকে আমার অবতার বিষয়ে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি আমার বিষয়ে কি দেখেছ ও বুঝেছ?'

তখন গিরিশ তাঁর পায়ের কাছে বসলেন জানু পেতে। আর হাত জোড় করে গদগদকণ্ঠে বললেন, 'স্বয়ং শুকদেব, ব্যাস যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি আর আপনার কথা কি বলব? আমি ত ছার।'

ঠাকুর শুনে তুষ্ট হলেন এবং সমাধিস্থ হয়ে গেলেন সেখানে দাঁড়িয়েই। খানিক পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরলে, সকলকে বললেন, 'তোমাদের আর কি বলব, তোমাদের চৈতন্য হোক।'

তারপর অর্ধবাহ্য দশায় অর্থীদের দৈবশক্তিতে স্পর্শ করতে লাগলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ প্রার্থনা জানালেন, 'আমি যাতে অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা করে দিন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ 'আচ্ছা' বলে তাঁর বুক ছুঁয়ে দিলেন। তখন তাঁর নিজের অবস্থার বর্ণনা বৈকুণ্ঠ দিয়েছেন এই ভাবে—আমার অন্তরে অপূর্ব ভাবান্তর হল। আকাশ বাড়ি গাছপালা মানুষ ইত্যাদি যা কিছু দেখলুম তার মধ্যেই ঠাকুর হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন মূর্তিতে রয়েছেন। আমি প্রবল আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলুম।·· কয়েকদিন পর্যন্ত আমার ঐরূপ ভাব ও দর্শন জাগ্রতকালে সর্বক্ষণ উপস্থিত রইল। সকল বস্তুর মধ্যে ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হতে লাগলুম। অফিসে বা অন্য কাজে যেখানে যেতে লাগলুম সেখানেই ওইরকম হতে লাগল।···অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে কেন তা প্রতিসংহারের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তার কিঞ্চিৎ আভাস হৃদয়ঙ্গম হল। ···কখন কখন মনে হল, পাগল হয়ে যাব নাকি? তখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে সভয়ে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'প্রভু আমি এই ভাব গ্রহণ করতে পারছি না। যাতে এর উপশম হয় তা করে দাও।'···ওই প্রার্থনা করবার পরই উক্ত দর্শন ও ভাব হঠাৎ একদিন চলে গেল। আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁর কাছ থেকে ওই ভাব পেয়েছিলুম তাঁর দ্বারাই ওটি শান্ত হল।'

বুক ছুঁয়ে দিয়ে ভাবান্তর ঘটানো বা অভিভূত করে নেবার আর

এক অবশিষ্ট দৃষ্টান্ত হলেন অমৃত লাল ওরফে হাবু দত্ত। তিনি বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভাই। উত্তর জীবনে হাবু দত্ত বাংলার এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুণী হয়েছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতের কৃতী কলাবৎ তিনি—ক্ল্যারিও নেট এসরাজ, বীণা ও সুরবাহার-বাদক। রামপুর ঘরণার স্বনামধন্য বীণকার উজীর খাঁর এক স্বীকৃত শিষ্য হাবু দত্ত। পরবর্তীকালের ওস্তাদ আলা-উদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে হাবু দত্তের যন্ত্র-সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন। দত্তজা গিরিশচন্দ্রের কোন কোন নাটকের সঙ্গীত পরিচালকও থাকেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই বাড়িতে তিনি আবাল্য মানুষ। নরেন্দ্রপিতা বিশ্বনাথ আপন পুত্র এবং হাবু দত্তকে রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন একই সঙ্গে। বেণী ওস্তাদ, আহম্মদ খাঁ, কানাইলাল ঢেঁড়ী প্রমুখ ওস্তাদের কাছে দুজনেই শেখেন। তবে নরেন্দ্র হন প্রধানত গায়ক এবং অমৃতলাল যন্ত্রী। দুজনের জীবন যে যৌবনেই ভিন্নমুখী হয়ে যায়, তা বলা বাহুল্য তবে অমৃতলাল শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ভক্ত, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সহযোগী থাকেন তাঁর পেশাদার সঙ্গীত-সেবকের জীবনেও। ঠাকুরের জন্মতিথিতে কাঁকুড়গাছি যোগো-দ্যানে যে শোভাযাত্রা হত তিনি ক্ল্যারিওনেট-বাদক রূপে তার পুরোভাগে যোগ দিতেন। পরবর্তীকালে ইউরোপের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা, স্বামীজীর ভক্ত মাদাম কালভে যখন ভারত-ভ্রমণে বেলুড় মঠে আসেন তাঁর সংবর্ধনা সভায় হাবু দত্ত এসরাজ বাজান এবং মাদামের প্রশংসা পান। নরেন্দ্র নাথ এই গুণী আত্মীয়কে যে প্রীতির চোখে দেখতেন, তা নিম্নলিখিত ঘটনায় সুপ্রকাশ। ঠাকুরের হাবু দত্তকে স্পর্শ করে দেবার এই বিবরণী দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দের দ্বিতীয় অনুজ—

শ্রীরামকৃষ্ণের আরোগ্যলাভের কোন আশা যখন রইল না, তখন

নরেন্দ্র ভাবলেন, ঠাকুর ত আর দেহ রাখবেন না। তাহলে এ সময়ে তাঁকে দিয়ে স্পর্শ করিয়ে কাউকে মুক্তি লাভ করানো যায়। তিনি তাঁর খুড়তুতো ভাই হাবু দত্তকে তাই ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন। হাবু দত্ত জপ-ধ্যানের নামগন্ধও জানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্র বিশেষ করে অনুরোধ করলেন, হাবু দত্তকে ছুঁয়ে দিতে। কিন্তু ঠাকুর রাজি হচ্ছিলেন না। বললেন, 'আমি মরতে বসেছি। এখন আর কাকেও ছুঁয়ে দিতে পারব না।' নরেন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা। অবশেষে তিনি সম্মত হলেন। হাবু দত্ত মেঝেয় বসে। ঠাকুর তাঁর বুকে ছুঁয়ে দিলেন। তখনি হাবু দত্ত সমাধিস্থ হয়ে গেলেন একেবারে। নিস্পন্দ, স্থির পুতুলের মতন। প্রায় দুঘণ্টা এইভাবে কেটে গেল। তখন নরেন্দ্র ভয় পেলেন, পাছে মাথার শির ছিঁড়ে যায়। তিনি অনেক করে হাবু দত্তের চৈতন্য এনে তাঁকে নীচের বাগানে নিয়ে গেলেন। হাবু তখন আধ ঘুমের ঘোরে বললেন, 'আমি খুব বুঁদ নেশায় ছিলুম—ওই বুঁদ নেশাটা চাই।' তারপর থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বড় ভক্ত হন। ঠাকুর দেহত্যাগ করবার পর তাঁর পূজা না করে কখনও অন্ন মুখে দিতেন না।······

দত্ত মহেন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেন—হাবু দত্তকে স্পর্শ করার পর নরেন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে ঠাকুরকে বলেন, 'তোমার শরীর দিন কতক পরেই যাবে, আমার কি করে দেবে দাও।' তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ নিভৃতে নরেন্দ্রকে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করে দিলেন।······

বড়িষা সাবর্ণ চোধুরী পরিবারের যোগীন্দ্রনাথ হলেন ঠাকুরের অন্যতম চিহ্নিত শিষ্য। তিনি গুরুর যোগৈশ্বর্যের পরিচয় পান এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। ঠিক সে ধরনের ও অবস্থার দৃষ্টান্ত আর কারো ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। সে বিবরণ দেবার আগে যোগীন্দ্রনাথের কিছু পরিচিতি

উল্লেখ্য। তাঁর প্রতি স্বামীজীর এত আস্থা ছিল যে, পরবর্তীকালে তাঁর প্রস্তাবে যোগীন্দ্রনাথ হন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহ-সভাপতি। সন্ন্যাস-জীবনে স্বামী যোগানন্দ নামে সুপরিচিত তিনি। শ্রীমা সারদা দেবীর সেবায় যোগানন্দ মন-প্রাণ সমর্পণ করেন এবং এ বিষয়ে স্বামী সারদানন্দের পূর্বসূরী। আর তরুণ বয়সেই তিনি গুরু সমীপে আসেন। সেই বয়সেই ঠাকুরের প্রিয় হন ত্যাগী, ধ্যানী, বৈরাগ্যবান বলে। গুরু তাঁর চক্ষুর উপমায় বলতেন, 'অর্জুনের চোখের মত।' মঠ-জীবনে এই অর্জুন চক্ষুর জন্যে যোগানন্দ সকলকে আকৃষ্ট করতেন। নরেন্দ্র বলতেন, 'যোগীনের যেন জগন্নাথের চোখ।' কারণ তাঁর চক্ষু সর্বদাই লাল হয়ে থাকত, তিনি এত ধ্যান করতেন দক্ষিণেশ্বরে ও অন্যত্র। স্বামীজী তাঁর আর একটি গুণ কীর্তন করতেন—'আমাদের ভিতর যদি সর্বতোভাবে কেউ কামজিৎ থাকে ত সে যোগীন।' আর নিরঞ্জনানন্দ ভালবাসা জানাতেন এই বলে—'যোগীন, তুমি আমাদের মাথার মণি।' শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে আগে দেহান্ত হয় যোগানন্দের (১৮৯৯)। তখন স্বামীজী বলেছিলেন, 'কড়ি খসলো, এবার আস্তে আস্তে বর্গা সবও খসে পড়বে।' আর শ্রীমা সারদা দেবীর উক্তি—'বাড়ির একখানি ইট খস্‌ল; এবার সব যাবে।'

ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তাঁর যোগ বিভূতির এক পরিচয় যোগানন্দ পেয়েছিলেন। শোকাহত শ্রীমাকে নিয়ে ঠাকুরের শিষ্যরা তখন তীর্থে গেছেন পশ্চিমে। ১৫ই ভাদ্র, ১৮৯৩, তাঁরা কলকাতা থেকে যাত্রা করেছেন। সারদা দেবীর সঙ্গে আছেন যোগীন্দ্র, লাটু, কালীপ্রসাদ, গোলাপ মা, লক্ষ্মীমণি, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) ও তাঁর পত্নী। বৈদ্যনাথ-ধাম, কাশী, অযোধ্যা হয়ে তাঁরা বৃন্দাবনের পথে চলেছেন।

সেসময়কার ট্রেন যাত্রার কথা। যোগানন্দ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন সেই রেল গাড়িতে। কিন্তু শরীরের যন্ত্রণার চেয়ে তিনি দায়িত্বের জন্যে বেশি দুশ্চিন্তা বোধ করলেন। এই প্রবল জ্বরে যদি তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন তাহলে শ্রীমাকে কত বিব্রত হতে হবে, বৃন্দাবনে যাবার বিভ্রাট বাঁধবে। এই ভাবনায় যোগানন্দ কাতর হলেন যতক্ষণ জ্ঞান রইল —'এঁদের কি করে বৃন্দাবনে নামাবে ?'

তখনই তিনি দেখলেন—ঠাকুর যেন বসে রয়েছেন স্থির হয়ে ! আর কাছেই এক বিকট চেহারায় জ্বরাসুর। সে যোগানন্দকে বললে, 'তোকে দেখে নিতুম ; তা পারলুম না তোর গুরু পরমহংসের জন্যে। তোকে এখনই ছেড়ে দিতে হচ্ছে। (লাল কাপড় পরা এক স্ত্রীমূর্তিকে দেখিয়ে). এই বেটিকে রসগোল্লা দিস।'

ভোরেই যোগানন্দের জ্বর ছেড়ে গেল।

সেই রহস্যের একটি সূত্র পাওয়া যায় কয়েকদিন পরে। তখন তাঁরা জয়পুরে এসেছেন। সেখানে দেবাদি দর্শন করছেন মন্দিরে মন্দিরে। এমন সময় একটি দেবালয়ে দেখলেন, সেই ট্রেনে দেখা মূর্তির মতন বিগ্রহ, লাল কাপড় পরিধানে।

মূর্তি দেখে যোগানন্দ রেলগাড়ির সব কথা গোলাপমাকে জানালেন। তখন স্থির করা হল, এই রক্তাম্বর পরিহিতা দেবী বিগ্রহকে মিষ্টান্ন ভোগ দিতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই রসগোল্লার দোকান পাওয়া গেল। যোগানন্দ সেই মিষ্টান্ন কিনে এনে ভোগ দিলেন দেবীকে, জ্বরাসুরের কথা অনুসারে।

সম্ভবত রেলগাড়িতে দেখা সেই দেবী হলেন শীতলা। তাঁর কারণে যোগানন্দের বসন্ত রোগ হত, যেজন্যে তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন।

জ্বরাসুর দেবীর অনুচর স্বরূপ আসে যোগানন্দের কাছে। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় তিনি বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা পান।

ঠাকুরের যোগ বিভূতি সব চেয়ে বেশি বার প্রকাশ পায় নরেন্দ্রনাথের কাছে। প্রিয়তম শিষ্য গুরুর দৈবীশক্তি নানা ভাবে নানা উপলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ করেন। তার কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হল এখানে।

কলকাতায় একদিনের কথা। নরেন্দ্র তার কিছুদিন আগে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি যান দক্ষিণেশ্বরে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলকাতায় কোন ভক্তগৃহে আসেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেখানে। ঠাকুরও নরেন্দ্রকে বেশিদিন না দেখে থাকতে পারেন না। কখনো চলে আসেন গৌরমোহন মুখুজ্যে স্ট্রীটের বাড়িতে। কখনো বা যে ভক্তের বাড়িতে এসেছেন, সেখান থেকে বার্তা পাঠান নরেন্দ্রকে, এসে দেখা করার জন্যে।

সেদিনও ঠাকুর রামচন্দ্র দত্তের গৃহে এসেছেন, মধু রায় লেনে। কাছেই নরেন্দ্রের বাড়ি। তাই কালীপ্রসাদ প্রভৃতিকে বললেন, নরেন্দ্রকে ডেকে আনতে।

তাঁরা নরেন্দ্রের কাছে এসে দেখেন, তিনি মাথার দারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রয়েছেন।

কালীপ্রসাদ তাঁকে বললেন, 'ঠাকুর তোমায় ডেকেছেন, চল।'

নরেন্দ্র জানালেন, 'কি করে যাব ? এই অবস্থা দেখছ ত।'

কালীপ্রসাদ বললেন, 'তুমি না গেলে তিনিই আসবেন। চল আমরা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

অগত্যা নরেন্দ্র অতি কষ্টে এলেন তাঁদের সঙ্গে। রামদত্তের বাড়িতে ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।

ঠাকুর তাঁকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, 'কিরে তোর কি হয়েছে ?' বলে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কি আশ্চর্য ! সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রর উৎকট শিরোযন্ত্রণা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। কি আরাম বোধ করলেন তিনি।

এ সম্পর্কে নরেন্দ্রের নিজের মুখের কথা—'আমার মাথার যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল তা মুখে বলার নয়। কেউ যেন একটা শাবল দিয়ে মাথার নীচে চাড়া দিচ্ছিল। কিন্তু পরমহংসদেব হাত ছুঁতেই সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। কি আশ্চর্য শক্তি। Thus I have witnessed the most wonderful power which our great Master Sri Ramakrishnadeva pessessed. But he seldom used the power.'...

একদিন নরেন্দ্রর 'প্রেমধন বিলায় গোরা রায়' গানখানি শোনাচ্ছিলেন শরৎ (সারদানন্দ) ও শশীকে (রামকৃষ্ণানন্দ)। গান গাইতে গাইতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব আরোপ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণে। আর গানটি শেষ করে সেই অনুষঙ্গে বললেন, (দক্ষিণেশ্বরের গোরাচাঁদ) 'সত্য সত্যই প্রেম বিলাচ্ছেন।...কি অদ্ভুত শক্তি।'

তারপর একটু থেমে, অলৌকিকের আভাস দিলেন—'রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, হঠাৎ আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন—শরীরের ভিতর যেটা আছে, সেটাকে। পরে কত কথা কত উপদেশের পর আবার ফিরতে দিলেন। সব করতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করতে পারেন।'...

প্রথম দিকে ঠাকুর যখন অদ্বৈতবাদের কথা বলতেন, বিশুদ্ধ বেদান্তের তত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতেন, নরেন্দ্রের সেসব হৃদয়ঙ্গম হত না।

সর্বভূতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বিরাজ করছেন এই তত্ত্ব তিনি মানতেন না। দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের অসাক্ষাতে হাসাহাসি করতেন 'তামাক ব্রহ্ম,' 'হুঁকো ব্রহ্ম' ইত্যাদি রসিকতা করে। একদিন এমনিভাবে প্রতাপ হাজরাকে বলেছিলেন, 'তা কি কখনো হয়? ঘটি ঈশ্বর বাটি ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি আর আমরা সকলেও ঈশ্বর!'

হাজরাও নরেন্দ্রের এই ব্যঙ্গ-কথায় যোগ দিলেন। আর হাসতে লাগলেন দুজনে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের বাইরে তাঁদের এই রকম কথাবার্তা হচ্ছিল।

ঠাকুর তখন তাঁর কক্ষে ছিলেন অর্ধবাহ্য দশায়। নরেন্দ্রের হাস্য পরিহাস তাঁর কানে গেল। পরিধেয়টি বগলে নিয়ে তিনি বাইরে এলেন। আর 'তোরা কি বলছিস রে?' বলে, কাছে এসেই নরেন্দ্রকে বক্ষ স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

নরেন্দ্র তখনকার নিজের অবস্থা এইভাবে জানান, 'ঠাকুরের ঐ দিনের অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্তে আমার ভাবান্তর হল। স্তম্ভিত হয়ে সত্যই দেখতে লাগলুম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সত্যই অন্য কিছুই আর নেই। তা দেখেও নীরব রইলুম—দেখি কতক্ষণ পর্যন্ত ওই ভাব থাকে। কিন্তু সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমল না। বাড়িতে ফিরে সেখানেও তাই—যা কিছু দেখছি কেবলি তিনি। এই বোধ হতে লাগল। খেতে বসলুম, দেখি অন্ন, থালা, যিনি পরিবেশন করছেন, সেসবই। আর আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে।....এইভাবে খেতে শুতে কলেজে যেতে, সব সময়েই ঐরকম দেখতে লাগলুম আর সর্বদা কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলুম·· হাত পা এইসময়ে সর্বদা অসাড় হয়ে থাকত আর আহার করে কিছু মাত্র তৃপ্তি হত না; মনে হত যেন আর কেউ

খাচ্ছে।···যখন সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কমে যেত, তখন জগৎটাকে স্বপ্ন বলে মনে হত।···ঐ ভাবে কিছুকাল পর্যন্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাইনি। যখন প্রকৃতিস্থ হলুম তখন বুঝলুম, ওই অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস। তবে ত শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যা লেখা আছে, তা মিথ্যা নয়। তখন থেকে অদ্বৈতবাদের ওপর আর কখনো সন্দেহ জাগেনি।'

তাহলে, ঠাকুরের এই ছুঁয়ে দেবার ব্যাপারটি কি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল নরেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবনে, তাঁর অদ্বৈতবাদের প্রত্যয়ে! যোগসিদ্ধ গুরুর স্পর্শের প্রভাবে শিষ্যের মধ্যে কি যুগান্তকারী শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়! শ্রীরামকৃষ্ণের এই বৈদ্যুতিক স্পর্শশক্তি তাঁর যোগৈশ্বর্যের অন্যতম। গুরুর এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে নরেন্দ্র অভিজ্ঞ হন কয়েকবারই। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত পরে আরো দেওয়া হবে।

এখন, এসময়কার নরেন্দ্রনাথ আর একটি যে অদ্ভুত অনুভূতি লাভ করেন, সেকথা বর্ণনীয়। তিনি প্রায়স ঠাকুরের ধ্যানী মূর্তি দেখতেন—দক্ষিণেশ্বরে নয়—কলকাতায় নিজেদের বাড়িতেই! আবার এক রাত্রে আরো অভূতপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন—ঠাকুর তাঁর কাছে এসে বলছেন, 'চল্, আমি তোকে ব্রজ-গোপী শ্রীরাধিকার কাছে নিয়ে যাব।' বলে, তিনি অগ্রসর হলেন। নরেন্দ্রও অনুসরণ করলেন তাঁকে। খানিক দূর গিয়ে ঠাকুর দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'আর কোথা যাবি?' এই বলে স্বয়ং শ্রীরাধিকার বেশ ধরলেন।

নরেন্দ্র নিছক স্বপ্ন ভাবেননি এই দৃশ্যকে। ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তির প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি নিজেও আগ্রহ বোধ করেন রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি ভাবে। তার একটি ফল তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গে

দেখা যায়। আগে তিনি প্রধানত গাইতেন ব্রহ্ম-সঙ্গীত। কিন্তু এখন থেকে কীর্তনাঙ্গও গাইতে আরম্ভ করলেন। সেসব কীর্তনের বিষয় হল রাধার কৃষ্ণপ্রেম বা ভগবানের প্রতি আকুল আবেদন নিবেদন এবং বিরহ কাতরতা।

ওই স্বপ্ন বৃত্তান্তটি তিনি গুরুভাইদের কাছেও বলতেন।

তখন তাঁরা জানতে চান, 'তুমি কি বিশ্বাস কর এ স্বপ্নের মর্ম সত্য ?'

নরেন্দ্র উত্তর দিতেন, 'নিশ্চয় করি।'…

নিজের যোগৈশ্বর্য সম্পর্কে ঠাকুর স্পষ্টই নরেন্দ্রকে বলেছিলেন। এমন কি একদিন এই দৈবীশক্তি দিতেও চান প্রিয় শিষ্যকে। কিংবা হয়ত তা দান করতে চেয়ে নরেন্দ্রকে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে আকৃষ্ট হন কিনা।

সেদিন তিনি শিষ্যকে বললেন, 'দেখ্, তপস্যার ফলে আমাতে অণিমাদি বিভূতি অনেকদিন এসেছে। ভাবছি, মাকে বলে তোকে ঐসব দি। কারণ মা জানিয়েছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে। ঐসব শক্তি তোর ভিতর সঞ্চারিত করলে কার্যকালে ঐসব ব্যবহার করতে পারবি। কি বলিস ?'

শিষ্য কিন্তু পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন। গুরুরই উপযুক্ত মনোভাব দেখিয়ে, 'তাতে কি আমার ঈশ্বর লাভে সাহায্য হবে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানান, 'না। সহয়াতা না হলেও ঈশ্বর লাভ করে যখন কাজ আরম্ভ করবি তখন তারা সাহায্য করতে পারবে।'

নরেন্দ্র তবু সম্মত হননি। বলেছিলেন, 'যদি ওসব এখন পেলে উদ্দেশ্য ভুলে যাই, স্বার্থপর হয়ে অযথা ব্যবহার করি তাহলে সর্বনাশ হবে যে।'

ঠাকুর আর কিছু বলেননি তাঁকে। শিষ্যের উত্তরে মনে মনে হয়ত সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। যোগবিভূতি সম্পর্কে নিজের মনোভাব তিনি জানিয়েছেন অনেকবার। যেমন একদিন দক্ষিণেশ্বরে যোগীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ সেদিন পঞ্চবটিতে একজন হঠযোগীর কাছে শুনছিলেন হঠযোগের কথা।

ঠাকুর দেখতে পেয়ে তাঁকে বলেন, 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাসনি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের ওপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবেনা।'

সেই যোগবিভূতির আর একটি নিদর্শন উল্লেখ করতে হয়। এটিও ঠাকুর প্রয়োগ করেন নরেন্দ্রের ওপরে। অঙ্গ স্পর্শ করে অলৌকিক আলোড়ন জাগানো। ভূমার দ্যোতনায় প্রণোদিত করা।

নরেন্দ্রের এই অভিজ্ঞতাও প্রথম দিকের। অর্থাৎ তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন মাত্র আসছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধন ঘটেনি তখনো। শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তরিক প্রীতিতে বাঁধা পড়েছেন। কিন্তু আকৃষ্ট হননি ঠাকুরের দার্শনিক মতে, অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্বে। সর্ব বস্তুতে চৈতন্য-রূপে ঈশ্বরের অবস্থিতি তিনি স্বীকার করতে পারেন না। তর্কের মধ্যে রহস্যচ্ছলে শোনান, 'ঘটি বাটি সবই আপনার কাছে ভগবান!'

তখন একদিন তাঁকে ঠাকুর বলেছিলেন – নিজের বুকে হাত দিয়ে, নিজেকেই দেখিয়ে—'এর তত্ত্ব এখন জানতে পারবে না। পরে যখন সময় হবে, আপনি ঠিক বুঝবে।'

তারপর একদিন তিনি স্বয়ং তা বোঝালেন নরেন্দ্রকে। লীলাভাবে শিষ্যকে দিব্য দর্শন করালেন।

ঘটনাস্থল দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সেই বাসকক্ষ। সদানন্দ ঠাকুর, মনের সুখে কথা বলছিলেন নরেন্দ্রের সঙ্গে। হঠাৎ তাঁর মনে কি হল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর নরেন্দ্রের কাছে এসেই ছুঁয়ে দিলেন তাঁর বুক।

সে যে কি তড়িৎ শক্তির স্পর্শ আর তার ফলে নরেন্দ্রের চৈতন্যে যে দুস্তর ভাবান্তর ঘটল, তা বর্ণনা করাও কঠিন। সে এক অতিলৌকিক সংঘঠন। ঠাকুরের লীলায় যে বিরাট উপলব্ধির পাত্র হলেন নরেন্দ্র, যুগপৎ তিনি তার দ্রষ্টাও হয়ে উঠলেন। সেই বিপুল অবস্থান্তর দেখতে লাগলেন সেখানেই বসে। যেন আকাশপট উন্মোচিত করে মহা দৃশ্যের অবতারণা হল। চোখের সামনে থেকে সব সীমারেখা ঘুচিয়ে অনন্তের উদ্ভাসন। কক্ষের চতুর্দিকে দেওয়াল মিলিয়ে গেল কোন্ শূন্যে। অন্তরীক্ষে বিলীন হয়ে গেছে ঘরের আচ্ছাদন। ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সেই অবাধ একাকারে একটি সত্তা ভাসমান। 'পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন এইভাবে বর্ণিত করেছেন নরেন্দ্রনাথের সেই দর্শন-অনুভব। যেন প্রলয়কালের কারণ সলিলে মজ্জমান এই কল্লোলিত জগৎ প্রপঞ্চ। আবার বিশ্ব চরাচর যেন সঙ্কুচিত হয়ে তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সেই অনাদি অনন্ত বিরাট-কায় সকল ধারণার পরে। ব্রহ্মের সে অবর্ণনীয় লীলা। যার মধ্যে উৎপত্তি তাতেই বিলয়। ঊর্ণনাভ সৃষ্টি-জালের উপমায় কেবল তার বুদ্ধি-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভব।

সেই ভয়ঙ্কর প্রলয় প্রকট দেখে ত্রস্ত, আকুল হয়ে উঠলেন নরেন্দ্র। তিনি আর্তকণ্ঠে ঠাকুরকে বলে উঠলেন—'ওগো, এ তুমি আমার কি করলে? ঘরে আমার যে মা বাবা আছেন।'

আলোড়িত বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে ঠাকুর আবার তাঁর বুক ছুঁয়ে দিলেন। অমনি দেবী দর্শনাদি থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত হলেন নরেন্দ্র।

এমন যোগশক্তি প্রয়োগের সময় ঠাকুরের এই শক্তি প্রকাশ পেত। তিনি ভাব জাগাতেন, আবার নিবৃত্তও করতেন সেই তুঙ্গ অবস্থা থেকে। আধারের ওপর এমনি অধিকার তাঁর।

মনে হয়, নরেন্দ্রের প্রতি তিনি বিভূতি দেখাতেন সচেতনভাবে। কারণ তার ফলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও অগ্রগতি ঘটত। পূর্ণতা আসত তাঁর বোধে, উপলব্ধিতে, জীবনে। যেমন তত্ত্ব আলোচনায়, তেমনি যোগৈশ্বর্যের প্রভাবেও তিনি ঈশ্বরলাভে অগ্রসর করে দিতেন প্রিয় শিষ্যকে।

সভ্য বর্ণিত প্রসঙ্গের চেয়ে নরেন্দ্রের পক্ষে আরো গুরুত্বপূর্ণ এক অভিজ্ঞতার কথাও এখানে বলা যায়। তাও পরমহংসদেবের আর এক প্রকার দৈবী শক্তির প্রভাবে। এই ঘটনার ফলে নরেন্দ্রের ধর্ম-জীবনে ভক্তি-ভাবের সূত্রপাত হয়, যা প্রচ্ছন্ন বা অস্ফুট ছিল তাঁর মধ্যে। জগজ্জননীকে নরেন্দ্রের কালীরূপ দর্শন ও বরদাত্রীরূপে তাঁর চরণে আত্মনিবেদনও সম্ভব হয় শ্রীরামকৃষ্ণের যোগশক্তি বলে।

যে সুখী সুকুমার তরুণ সঙ্গীত সংস্কৃতি চর্চায় নিশ্চিন্ত জীবন অতিবাহিত করতেন. বৃহতের ধারণায় কখনো নিমগ্ন হতেন, সেই নরেন্দ্রের তখন এক চরম সঙ্কটকাল এসেছে। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে বিপর্যস্ত তাঁর পারিবারিক জীবন। আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। প্রচুর ঋণ রেখে গেছেন বহু উপায়ী, বহুজন-পালক পিতা। জ্ঞাতিশত্রুরা ভিটার অংশীদার হয়ে নরেন্দ্রদের বিরুদ্ধে মামলা চালাচ্ছেন। তাঁরা ন্যায্য অংশ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন তার ফলে। সম্পত্তি বিভাগের মোকদ্দমা আগে থেকেই চলছিল। এবার গৃহচ্যুত হলেন তাঁরা। মা ও নাবালক ভাইবোনদের সঙ্গে নরেন্দ্র আশ্রয় নিয়েছেন মাতুলালয়ে,[৭] রামতনু বসু লেনে। চাকুরির

সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। অনাহারেও কাটছে কোন কোন দিন। সহায় সম্বলহীন গৃহহীন এবং প্রায় নিরন্ন অবস্থা তখন।

সেই চূড়ান্ত দুর্দশার সময় একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের কথা চিন্তা করলেন। তাঁর প্রসাদে যদি কিছু আর্থিক সুরাহা হয়, মা ও নাবালক ভাইবোনদের কষ্ট লাঘব করতে পারেন তাহলে।

পরমহংসদেব ঈশ্বরের প্রিয়! জগজ্জননী তাঁর কথা শোনেন। তাঁর কাছে অনুরোধ করব মা ভাই বোনদের দুঃখ লাঘব করবার জন্যে। তিনি যেন মা কালীর কাছে প্রার্থনা জানান। আমার জন্যে তিনি তা করলেন না কি?

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে বললেন সেকথা।

'আপনাকে আমার মা ভাইদের আর্থিক কষ্ট দূর করতে মাকে জানাতে হবে!'

ঠাকুর জানতেন, নরেন্দ্র কি দুরবস্থায় পড়েছেন পিতৃবিয়োগের পরে। প্রিয় শিষ্যের কষ্ট দেখে তিনি নিজেও কাতর হয়েছেন। কতজনকে বলেছেন, তাঁকে চাকুরি করে দেবার জন্যে। কিন্তু তিনি নিজের মুখে মা কালীকে টাকার জন্যে প্রার্থনা করতে পারবেন না। নরেন্দ্র-তুল্য প্রাণ-প্রিয়ের জন্যেও না। তা ভিন্ন, আরো একটি ইচ্ছা তাঁর মনে হতে পারে। তিনি চান যে নরেন্দ্র নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাক। মায়ের প্রতি শিষ্যের বিশ্বাস ও ভক্তি হোক এই উপলক্ষ্যে। অর্থাৎ মা কালীকে যেন মেনে নেন নরেন্দ্র, একথাও তিনি ভাবতে পারেন। তাই শিষ্যের এই অনুরোধ শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ওরে, আমি যে ওসব কথা মাকে বলতে পারিনা। তুই নিজে মার কাছে যা না কেন? তুই যে মাকে মানিস না—সেজন্যেই তোর এত কষ্ট।'

নরেন্দ্র সে কথা স্বীকার করেও তেমনি সজোরে বললেন, 'আমি ত মাকে মানি না—আপনি আমার জন্যে মাকে বলুন—বলতেই হবে। আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।'

কিন্তু ঠাকুর নিজে বলতে রাজি হলেন না। তবে উপায় বলে দিলেন নরেন্দ্রকেই। মার কাছে যা চাইবেন, তাই মিলবে। বললেন, 'আচ্ছা, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি,মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি—তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন ?'

নরেন্দ্র একথায় আর অসম্মতি জানাতে পারলেন না। তিনি প্রস্তুত হলেন বিগ্রহের সামনে প্রার্থনা জানাতে। উৎকন্ঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন দিবা অবসানের জন্যে। সেদিন অমবস্যা তিথি।

ক্রমে সন্ধ্যা হল। তারপর পার হয়ে গেল রাত্রির প্রথম প্রহর। গভীর অমাবস্যা আরম্ভ হল।

তখন নরেন্দ্র উঠলেন, ঠাকুরের আদেশ অনুসারে। মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু ওইটুকু যেতে যেতেই যেন গাঢ় নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। পা টলতে লাগল নেশাগ্রস্তের মতন। আর অন্তরে এই ভাব জাগল যে সত্যই মাকে দেখবেন, মার আশীর্বাদ পাবেন। এই বিশ্বাসে তাঁর মনও একাগ্রমুখী হল।

তিনি দাঁড়ালেন কালীঘরে এসে। সামনে দেবী প্রতিমা। নরেন্দ্র দেখলেন— মা সত্যই চিন্ময়ী। সত্যই জীবন্ত। ভক্তিতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বার বার প্রণাম করলেন দেবীকে।

প্রার্থনা জানাতে লাগলেন—অর্থ নয়, চাকুরি নয়, মা ভাইদের

অভাব, কষ্ট দূর করবার কথাও নয়—'মা, আমাকে বিবেক দাও। বৈরাগ্য দাও। জ্ঞান ভক্তি দাও। যাতে তোমার নিত্য দর্শন পাই তাই করে দাও।'

বলতে বলতে হৃদয় তাঁর এক অপূর্ব ভাবে, শান্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল। বাহ্য জগৎ সংসার সব লুপ্ত হল চেতনা থেকে। চিত্তে আর কিছু নেই—শুধু মাতৃ-মূর্তি রইলেন।

কতক্ষণ পরে নরেন্দ্র ফিরে এলেন ঠাকুরের কাছে। তাঁর তখনো অভিভূত অবস্থা।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে মার কাছে সংসারের অভাব দূর করবার প্রার্থনা করেছিস ত?'

প্রশ্ন শুনে নরেন্দ্রের যেন চমক ভাঙ্গল। তিনি বললেন, 'না। ও প্রার্থনা করতে ভুলে গেছি।'

শুনে ঠাকুর বললেন, 'ভুলে গেছিস? তাহলে যা, ফের যা। গিয়ে মাকে ওই কথা জানা।'

নরেন্দ্র এবার ওইরকম সংকল্প করলেন। আবার মন্দিরে এলেন। দেবীকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু আবার ভুল হয়ে গেল সংসারের কথা বলতে। আবার তেমনি ভাবান্তর হল। চিন্ময়ী জননীর কাছে এবারও চাইলেন—সেই বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান।

তারপর ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি হেসে বললেন—যেন কিছু জানেন না—'কিরে এবার বলেছিস ত?'

নরেন্দ্র চমকে উঠে বললেন, 'না, মশায়, মাকে দেখেই কি এক দৈবী শক্তিতে সব ভুলে গেলুম। কেবল বিবেক জ্ঞান ভক্তি লাভের কথা বলেছি। কি হবে?'

ঠাকুর বললেন, 'নিজেকে সামলে ঐ প্রার্থনাটা করতে পারলি না? তা পারিস ত আর একবার গিয়ে ওই কথাগুলো বলে আয়। শীগ-গীর যা।'

নরেন্দ্র আবার গেলেন। এবার প্রস্তুত হয়ে এলেন মনে মনে। অনেক সচেতন রইলেন। কিন্তু কালীঘরে এসে দেবীকে প্রণাম করতেই অন্য ভাব জাগল। লজ্জা পেয়ে ভাবলেন—কি তুচ্ছ কথা বলতে এসেছেন মাকে। নিজেই মর্মাহত হলেন। আর বার বার প্রার্থনা জানালেন, 'অন্য কিছু চাইনা মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও।'

তারপর মন্দিরে থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার বাইরে এসে তাঁর মনে হল,—এ নিশ্চয় ঠাকুরের খেলা। না হলে তিনবার এসেও কেন মাকে ওকথা বলা হল না? (ঠাকুরের যোগবিভূতিতে তাঁর বিশ্বাসও একথায় বোঝা যায়)।

তিনি চলে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। তাঁকে বললেন, 'আপনি নিশ্চয় আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনাকেই বলতে হবে।'

ঠাকুর সেথা মানলেন না। উত্তর দিলেন, 'তুই চাইতে পারলি না। তোর অদৃষ্টে যে সংসার সুখ নেই, আমি কি করব।'

নরেন্দ্র তবু নিরস্ত হলেন না। ঠাকুরকে বললেন ওই প্রার্থনা করতে।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—যেন জননীর আদেশ নিয়ে তাঁকে অভয় দিলেন—'আচ্ছা যা, তোদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব কখনো হবে না।'

নরেন্দ্রের এমনই প্রত্যয় ছিল ঠাকুরের কথায় যে তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন, মা ও ভাইবোনদের ব্যাপারে।

তারপর থেকে তাঁর অধ্যাত্মজীবনে এই পূর্ণতা এল যে তিনি ভক্তি-

মান হলেন। ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখাবার পর থেকে এবং এই ঘটনার আগে পর্যন্ত তিনি প্রণাম করতে পারতেন না দেব-দেবী বিগ্রহ।···

নরেন্দ্রের আরো দুবারের অভিজ্ঞতাও উল্লেখ্য। দুটিই সংক্ষিপ্ত, একেবারে শেষ পর্যায়ের এবং কাশীপুর বাগান বাড়িতে।

তখন ঠাকুরের ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের জর্জর অবস্থা। জীর্ণ বস্ত্রের মতন ত্যাগ করবেন আর মাত্র দুদিন পরে। গলক্ষতের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে রয়েছেন অসীম মনোবলে। কথা বন্ধ। বক্তব্য জানাচ্ছেন ইসারায়। সেসময় তাঁর রোগশয্যা পাশে সেবাপর নরেন্দ্র আছেন। গুরুর অবস্থা মনে মনে পর্যালোচনা করে এক প্রকার সংশয় জাগছে তাঁর মনে। এত কষ্ট পাচ্ছেন এই বিধ্বস্ত দেহ নিয়ে! ইনিই ঈশ্বরের অবতার? তিনি নিজেই ত আগে নিজেকে ভগবানের অবতার বলেছেন আমাদের কাছে। এখন এই ভীষণ শারীরিক কষ্টের মধ্যেও যদি বলতে পারেন 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।

তিনি এমনি চিন্তা করা মাত্র ঠাকুর মুখ ফেরালেন তাঁর দিকে। সেই মর্মান্তিক যাতনার মধ্যেই উচ্চারণ করলেন, 'এখনো তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীরে—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।,

নরেন্দ্র কোন কথা বলতে পারলেন না। মৌন রইলেন মনস্তাপে, অপরাধ বোধ করে। তাঁর অশ্রু ঝরতে লাগল।

তার দুদিন পরেই ঠাকুর দেহত্যাগ করলেন—৩১ শ্রাবণ ১২৯৩, ঝুলন পূর্ণিমার রাতে।

তার পরের ঘটনা হল--দেহান্তের এক সপ্তার মধ্যেই।

তখন রাত্রি। নরেন্দ্র সেই বাগানে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছেন এক

গুরু-ভাই।

হঠাৎ নরেন্দ্র দেখলেন – সামনেই ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তি।

নরেন্দ্রের মনে হল—এ চোখের ভ্রম। তাই তিনি নির্বাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু পাশের গুরুভাই বলে উঠলেন—'নরেন দেখ দেখ!'

তখন নরেন্দ্র নিঃসন্দেহ হলেন। বুঝতে পারলেন—স্থূল দেহ ভস্মীভূত হলেও ঠাকুর শাশ্বত দিব্য দেহে দর্শন দিতে এসেছেন!

অমনি নরেন্দ্র ডাকতে লাগলেন সকলকে। কিন্তু তাঁরা আসার আগেই সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতিলৌকিক দর্শন—শ্রীমার জীবনে

সারদা দেবীর সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্ক আদ্যোপান্তই লৌকিকের ঊর্ধে।

বাইরে থেকে বিবাহিত জীবন বটে। কিন্তু কি অনুপম লোকাত্তর মহিমায় পূর্ণ। বর্তমান অধ্যায়ের বর্ণিতব্য বিষয় সবই ঠাকুরের দেহরক্ষার পরের কথা। তবে তাঁদের প্রাক-বিবাহকালীন এমন সংবাদও আছে যার বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না। বিবাহের সম্বন্ধ থেকেই সে অলৌকিক মাহাত্মের সূত্রপাত। ভাবী পত্নীর সন্ধান তিনি যখন নিজেই দিয়েছিলেন। চর্মচক্ষে না দেখে, না শুনে তাঁর সেই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী। সেই অলৌকিক দূরদর্শনে বধূ নির্বাচন।

অথচ তখনও চলেছে তাঁর ঈশ্বর লাভের জন্যে জীবনপণ তপস্যার পর্ব। চিন্ময়ী জগজ্জননী কালীকে এমন ভীষণ আবেদন জানাচ্ছেন, 'দেখা দে, না হলে গলায় ছুরি দিব'—এমনি তাঁর ভক্তির শক্তি। আর

অন্তরে তেমনি জ্বলন্ত বৈরাগ্য। তপচর্যার কঠোরতার সীমা নেই। তখন অনেক সময় উন্মাদ দেখায় তাঁকে। কখনো জড়বৎ। আবার কখনো অবস্থা স্বাভাবিকও হয়। কারণ বিশ্বমাতার দর্শন পান মাঝে মাঝে।

দক্ষিণেশ্বর থেকে এসব সংবাদ কামারপুকুরে আসে। ঘরের জননী উদ্বিগ্ন হন শুনে। সংসারের সকলের মতন তিনিও ভাবেন, এ বায়ু রোগ দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরকে বলে, গদাইকে কামারপুকুরে আনান।

এখানেও তাঁর ধরণধারণ দেখায় বায়ু-রোগীর মতন। কখনো স্বাভাবিক, কখনো অপ্রকৃতিস্থ।

সকলের পরামর্শে মা তখন তাঁর বিয়ে দেয়াই স্থির করলেন। পাত্রী খোঁজ করতে লাগলেন গোপনে। কিন্তু মনের মতন মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না।

গদাধর জানতে পারলেন সব। কিন্তু বিরক্ত হলেন না। বরং বিবাহের চেষ্টায় আনন্দ করলেন। এমনকি উৎসাহ দেখালেন এই উদ্‌যোগে। জননী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এবার গদাধর নিজেই পাত্রীর সন্ধান দিলেন—'জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখো গে। বিয়ের কনে সেখানে কুটো বাঁধা আছে।'

শুনেই মা সেখানে গেলেন পাত্রপক্ষে। মেয়েটিও দেখলেন সুলক্ষণা। কিন্তু বয়স যে সবে পাঁচ পার হয়ে ছয়ে পড়েছে!

তা হোক। গদাইয়ের নিজের কথা যখন।

সেই 'কুটো বাঁধা' কন্যার সঙ্গে ঠাকুর যে বিবাহ বন্ধন করলেন সে ত লৌকিক বিবাহ নয়। তারপর দু যুগ ব্যাপী তাঁর অবতারলীলা। একই সঙ্গে জ্ঞান ভক্তি ও ব্রহ্মবাদের জীবন্ত বিগ্রহ। অমৃত কথায় ও

আচরণে শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বাণী সাধারণ্যে প্রচার। সাধনা ও আরাধনার সমন্বয় করলেন, পন্থা দেখালেন। সকলের বোধগম্য সরল করে দিলেন ধর্মকে। ভক্তিমার্গের আদর্শ দৃষ্টান্ত হলেন। চিহ্নিত শিষ্যদের প্রস্তুত করে, যাত্রা করিয়ে দিলেন পূর্ণতার পথে—সাধন, জ্ঞান, ভক্তি ও সেবার সমাহারে। যোগ্য পাত্রে শক্তি সঞ্চার করলেন। ধর্মপত্নীকে যথাযোগ্য দীক্ষিত করলেন, গঠিত করে দিলেন সঙ্ঘজননীরূপে।

আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ হল। তারপর ছিন্ন পরিধানের মতন 'খোল' টা ফেলে চলে গেলেন।

সারদাদেবী আত্মসংবরণ করতে পারলেন না ঠাকুরের মহাসমাধিতে। শোকে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। স্বামীকে যে মা কালী জ্ঞান করতেন, তাও প্রকাশ হল তাঁর আর্ত কণ্ঠে। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তিনি মহা-শোকে কতক্ষণ মুহ্যমানা রইলেন। সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের অমৃত সম্পর্ক হারা।

পরে চৈতন্য ফিরে পেয়ে খুলতে বসলেন এয়োতির চিহ্ন, হাতের বালা।

তখনই প্রথম অলৌকিক দর্শন হল। তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্রীরামকৃষ্ণ! বললেন, 'হাতের বালা খুলো না। আমি কি কোথাও গেছি গা। এই যেমন এঘর থেকে ওঘর।'

শ্রীমার মনে কোন সন্দেহ, সংশয় নেই। তিনি চাক্ষুষ দেখলেন ঠাকুরকে। তাঁর অভয় বাণীও শুনলেন। বালা খুলতে কিংবা সিঁদুর মুছতে আর হাত উঠল না। বুঝতে পারলেন, ঠাকুরের পার্থিব দেহ কেবল চলে গেছে। কিন্তু তিনি বিরাজ করছেন দিব্য শরীরে।

সারদা দেবী থান কাপড়ও পরতে পারলেন না। তখন থেকে পরতে

লাগলেন লাল নরুণ পাড় শাড়ী।

ঠাকুর দেহত্যাগ করবার পনের দিন পরে যোগীন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রমুখ শিষ্যরা শ্রীমাকে তীর্থযাত্রা করালেন। দলে রইলেন লাটু, মাস্টার মশায় ও তাঁর পত্নী, লক্ষ্মীমণি ও গোপাল মা।

এ যাত্রায় ঠাকুর কয়েকবার শ্রীমাকে দর্শন দিলেন সূক্ষ্ম দেহে।

তখন তাঁরা কাশীতে রয়েছেন। সেদিন সারদা দেবী দেব-দর্শনে বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে। তারই মধ্যে— শ্রীমা নিজে বলেছেন— 'ঠাকুর বিশ্বনাথের মন্দির থেকে আমায় হাত ধরে নিয়ে যান।' সেসময় তিনি ভাবাবস্থায় ছিলেন।

আর একদিন তিনি রেলগাড়িতে যাচ্ছেন। অযোধ্যায় তীর্থ করে চলেছেন বৃন্দাবনে। ট্রেনের কামরায় তিনি তখন নিদ্রিতা ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওগো তোমার হাতে সোনার ইষ্ট কবচ অমন করে রেখেছ কেন ? ও যে চোর অনায়াসে খুলতে পারে।'

তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি উঠে বসলেন। তাঁর প্রথমেই চোখ পড়ল হাতের সোনার কবচটির দিকে। ঠাকুরের কথা মতন কবচ খুলে বাক্সের মধ্যে রাখলেন।

অন্য একদিনের কথা। তখন তাঁরা বৃন্দাবনে রয়েছেন। এই পুণ্য কৃষ্ণতীর্থে বড় ভাবান্তর হল সারদা দেবীর। তিনি বেশির ভাগ সময় ভাবাকুল, আবিষ্ট হয়ে থাকতেন। কৃষ্ণ-রাধিকার স্মরণে মননে সদা তদ্গত অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণের সব লীলাস্থলগুলি দেখতেন। আর দেখতে দেখতে তাঁর অশ্রু ঝরত। প্রায়ই হত ভাব-সমাধি।

তখন ঠাকুর দেখা দিয়ে আদেশ করলেন, 'যোগীনকে তুমি ইষ্টমন্ত্র দেবে।'

শ্রীমা মন্ত্র দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু একবার নয়, দুবার নয়—পর পর তিন দিন পেলেন ঠাকুরের এই আদেশ। আর তা পালিতও হল। সেদিন সারদা দেবী পূজায় বসেছিলেন। তারই মধ্যে যোগীনকে মন্ত্র দিলেন ভাবাবিষ্ট হয়ে।

বৃন্দাবনেই আর একদিনের কথা। তখন তাঁরা লালাবাবুর কুঞ্জে থাকেন। সেদিন শ্রীমার মনে কি হল, তিনি হাতের বালা খোলবার চেষ্টা করলেন।

তখনকার কথা তিনি নিজেই কালীপ্রসাদদের এই ভাবে জানিয়েছেন —'ঠিক সেবারও ঠাকুর স্থূল শরীরে দর্শন দিয়ে বললেন, 'তুমি হাতের বালা খুলো না। শ্রীকৃষ্ণ যার পতি, তার বিধবা হওয়া ভাগ্যে নেই। সে চির সধবা।'

এবারও তিনি নিবৃত্ত হন, ঠাকুরের কথায়।

নিরলঙ্কার হবার তৃতীয় প্রচেষ্টাও হয়, অনেক পরে। তীর্থ থেকে ফিরে তখন তিনি কামারপুকুরে আছেন। এবার হাতের বালা খুলতে চান নিজের ইচ্ছায় নয়। নিন্দুকের অভাব নেই পল্লী-সমাজে। সারদা দেবী যে এয়োতির চিহ্ন এখনো ধারণ করেন, এই নিয়ে গ্রাম-সমাজে কিছু বিরুদ্ধ কথা হয়। আর তা তাঁর কানেও আসে। আর তিনিও লোক-নিন্দার ভয়ে বিধবার সাজ নিতে যান।

ঠিক সেসময় ঠাকুর দেখা দেন পুনরায়। তাঁকে বালা খুলতে নিষেধ করেন।

'শুনেছি তার পর থেকে শ্রীমা আর কখনো হাতের বালা খুলতে চেষ্টা করেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে জেনেছিলেন যে শ্রীঠাকুর ছায়ার

মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন ও তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করছেন'— লিখেছেন স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্তান।

অরবিন্দের রামকৃষ্ণ-দর্শন

বর্ণিতব্য অতিলৌকিক প্রসঙ্গটি একাধিক কারণে অনন্য বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের বিদেহী সত্তার সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিতির এক বিস্ময়কর নিদর্শন এই 'ঘটনা'-টি। অন্যান্য অধ্যায়ে তাঁর এ ধরনের যে যোগবিভূতির নানা-বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতেও এটির স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। কারণ পূর্ববর্ণিত সমস্ত বৃত্তান্তই ঠাকুরের বাহ্যদেহে অবস্থানকালীন। কিন্তু বক্ষ্যমান বিষয়টি তাঁর দেহত্যাগের অনেক পরবর্তী, দু যুগ পরের ব্যাপার। আরো এক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে আছে। আগেকার সব প্রসঙ্গে দেখা গেছে, যাঁদের সম্পর্কে তাঁর নির্মাণকায় অথবা সূক্ষ্ম দেহে গমনাগমন ঘটেছে তাঁদের সকলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল। সেইসব ব্যক্তিরা ছিলেন তাঁর আত্মীয়, সন্ন্যাসী কিংবা গৃহী শিষ্য, শিষ্যা, অনুরাগী, ভক্ত প্রভৃতি।

কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম। কারণ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর কোনপ্রকার যোগাযোগই ছিল না। তাঁরা নামেমাত্র এবং অরবিন্দের শুধু বাল্য-জীবনে সমকালীন। পরস্পর চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারও তাঁদের হয়নি। কোন যোগসূত্র অসম্ভব ছিল দুজনের সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে শেষ পর্যায়ে অধিষ্ঠানের সময়ে অরবিন্দ বালক বয়সী। কেশবচন্দ্র প্রমুখের প্রচারের ফলে কলকাতার শিক্ষিত বা ধর্মোৎসুক সমাজের যোগাযোগ যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন অরবিন্দ

শিশু। তারপরই ১৮৭৯ সালে সাত বছরের বালক অরবিন্দ কলকাতা ছেড়ে বিলাত প্রবাসী হন। তখন থেকে ঠাকুরের দেহান্ত কালেও (১৮৮৬) তিনি থাকেন লণ্ডন নিবাসী, বয়স সেসময় চোদ্দ বছর। অবশেষে, ১৮৯৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন একুশ বছর বয়সে, একাদিক্রমে প্রায় পনের বছর প্রবাস-জীবনের পরে।

তারও প্রায় পনের বছর পরে আলোচ্য প্রসঙ্গ। অর্থাৎ অরবিন্দের রামকৃষ্ণ-দর্শন। আরো সঠিকভাবে বলা চলে, তাঁকে পরমহংসদেবের দর্শনদান। সেই ঐতিহাসিক আলিপুর বোমা মামলার সময়ের কথা। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করবার দু যুগ পরে।

তখন তিনি মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দরূপে বন্দিত হননি প্রকাশ্যত—যদিও সে মোকদ্দমার সময় তাঁর পক্ষীয় ব্যারিস্টাররূপে চিত্তরঞ্জন দাস তেমন ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলেন। সেসময় দেশবাসীর কাছে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী নেতা বলে পরিচিত, অভিনন্দিত। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের এক পরিচালক, তাত্ত্বিক নৈতিক প্রবক্তা। আজন্ম সাহেবীয়ানার মধ্যে লালিত, 'সাহেব' সিভিল সার্জন কে. জি. ঘোষের প্রিয় পুত্র 'অরো', আবাল্য বিলাতবাসী এবং সেখানেই সওয়া যুগ ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় বর্ধিত তরুণের ভারতে ফেরার পর কিভাবে স্বদেশীয় (ভারতীয়) মানসে উত্তরণ ঘটল এবং তিনি দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে উৎসর্গীকৃত হলেন, আবার পরে অতিমানসের আবাহনে মহাসাধকে পরিণত, সে দিব্য জীবনের বীজ কোথায় উপ্ত ছিল (প্রথম যৌবনে ব্রাহ্ম, কিন্তু পরিণত বয়সের বুদ্ধিতে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদক) মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র চরিত্রের গভীরে, তা এক পরমাশ্চর্য। অবশ্য পরহিতব্রত কৃষ্ণধন ঘোষ বহিরঙ্গে বিদেশী-

ভাবাপন্ন হলেও প্রচ্ছন্নভাবে জাতীয়তায় উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সেসব আলোচনার অবকাশ নেই এখানে। তবে অরবিন্দ জীবনের সেই সন্ধি-যুগ প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য। কারণ তাঁর বিপ্লবী-জীবন থেকে একান্ত যোগসাধন পর্যায়ে উত্তরণের কালেই আলোচ্য বিষয়টি নির্দিষ্ট।

ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত জীবনের অন্তঃস্তলেই তাঁর যোগজীবনের যে ধারা প্রবর্ধিত, প্রসারিত হয়ে চলেছিল—অরবিন্দ ঘোষের শ্রীঅরবিন্দে পরিণতির সেই উদ্‌বোধন পর্বে—শ্রীরামকৃষ্ণের এই 'আবির্ভাব'। নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া না গেলে এই উল্লেখ অবিশ্বাস্য বোধ হতে পারত। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, ঠাকুরের দেহত্যাগ থেকে দু যুগের ব্যবধানে এই প্রসঙ্গ।

অরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের পটভূমি আরো কয়েক বছর আগে থেকেই ধর্তব্য, যদিও তাঁর যোগ-সাধন অগ্রসর হয় স্বভাবতই লোক-লোচনের অন্তরালে। আশ্চর্য ঐতিহাসিক যোগাযোগে, তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন এবং স্বদেশীয় মুক্তিসাধনের বিপ্লবী জীবন সহযোগী, অঙ্গাঙ্গী, এমন কি একাত্ম ছিল। দেখা যায়, ওই দুটি ধারা যেন পরিপূরক রূপে যুক্ত রাখতে চান নিজের এবং সহযাত্রী স্বেচ্ছাব্রতীদের সংগ্রামী জীবনে। তার কিছু পূর্ব-সূত্র মনে রাখা যায়।

যেমন—১৯০৩ সালে তাঁর 'ভবানী মন্দির' পরিকল্পনা, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে। দেশের দিকে দিকে দেশ-জননীর মন্দির স্থাপন করা হবে। সঙ্গে থাকবে তরুণ কর্মযোগীদের আশ্রম। তারা চতুর্দিকে জনসাধারণের সঙ্গে যোগ রাখবে, গঠনাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আবার তাদের যোগাভ্যাসও চলবে অধ্যাত্মচর্চা তথা আত্মিক উন্নতির জন্যে। সেই সঙ্গে সংগ্রাম প্রস্তুতিও অগ্রসর হবে। সেসময় যে ধর্ম-গুরু

ও যোগীদের সঙ্গ এবং প্রেরণা লাভ তাঁদের লক্ষ্য ছিল তাও মুক্তি-যুদ্ধের সহায়তা তথা সার্থকতা লাভের আশায়। সেই উদ্দেশ্যেই প্রথমে নর্মদা নদীতীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে সেই তরুণ যোদ্ধাদের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল। অরবিন্দ সেসময় সেই আশ্রমগুরু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কৃপাও পান—যিনি ছিলেন উচ্চকোটির যোগী। তারপর যোগীবর সাখরিয় বাবার সিদ্ধির কথা অরবিন্দ শোনেন। নর্মদার অপর পারে যোগাযোগ করেন তাঁর সঙ্গে। সাখরিয় বাবার পরেও যোগীদের সন্ধানে তাঁরা তৎপর থাকেন। এই পর্বে মহারাষ্ট্রীয় যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেনের আশীর্বাদ নির্দেশাদিও পেয়েছিলেন তাঁরা। যোগসাধন বিষয়ে বিষ্ণুভাস্কর লেলের প্রভাব অরবিন্দ জীবনে স্বীকৃত। এইভাবে তাঁর বরোদা জীবন-পর্যায়েও যোগ-সাধন ও উপলব্ধি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল।

তারপর কিংবা সমকালেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তিনি কিভাবে আকৃষ্ট হতে থাকেন সেই মানস-প্রক্রিয়ার বিবরণ অজ্ঞাত, তবে তা ঠাকুর দেহত্যাগ করবার অনেক পরেই অবশ্য। মানসলোকের উত্তরণ লোক-চক্ষুর অগোচরে ঘটে। তার লিখিত বিবরণও অপ্রাপ্য। নব জায়ীয়তা-বাদের উৎসসন্ধানে অরবিন্দ-অন্তর কিভাবে বিলাতে অবস্থান কালেই বঙ্কিমকে আবিষ্কার করেন, সে রহস্য কি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে? তেমনি অধ্যাত্মচেতনার কোন্ গভীরে অবগাহন করে তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, তা আরো গূঢ় অধ্যায়। যখন তা প্রকাশ পায়, দেখা যায় পরহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধায়, আস্থায় তিনি পরিপূর্ণ। ঠাকুরের প্রতি তাঁর অপরিমেয় আস্তিক্যবোধ এবং সুচিন্তিত অভিমত তিনি বোমা মামলার পূর্ব থেকেই স্বসম্পাদিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অতিলৌকিক প্রসঙ্গও সেই মোকদ্দমার

সমকালীন। তার উল্লেখ আছে সেই যুগের একটি স্মৃতিচারণ গ্রন্থে, শ্রীঅরবিন্দের তৎকালীন জীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে তিনি যখন কলকাতা ত্যাগ করে যান। ইংরেজ শাসনের আওতার বাইরে আশ্রয় নেন চন্দননগরে। তাঁর সম্পর্কিত এই বিবরণী প্রামাণিক গণ্য করা যায়। কারণ বিবৃতিকার হলেন মতিলাল রায়। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে এবং স্বদেশের কল্যাণে কায়মনোবাক্যে তথা কর্মোদ্‌যোগে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ তিনি। অরবিন্দ জীবনের সেই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মতিলাল একটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। অরবিন্দের বিপজ্জনক গুপ্ত বাসকালে বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন রায় মশায়, তখন অবশ্য যুবক—গুপ্ত, বিপ্লবী আন্দোলনে যে-কোন আদেশ পালনের উপযুক্ত, বিশ্বস্ত কর্মী।

অরবিন্দ তখন নিবেদিতার পরামর্শ অনুসারে কলকাতা ত্যাগ করে এসেছেন। তাঁকে নিরাপত্তার জন্যে আনা হয় চন্দননগরে। সেই অবস্থায় তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ তথা গোপন অবস্থানের ভারপ্রাপ্ত হন মতিলাল। বিপ্লবী নেতাকে তিনি প্রথমে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। তারপর চন্দননগরেই অন্যান্য গৃহে রাখা হয় তাঁরই তত্ত্বাবধানে। মাস-খানেক পরে অরবিন্দের পণ্ডিচেরি যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। চন্দননগরে সেই বাসকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন মতিলাল। পরে তিনি পণ্ডিচেরিতেও অরবিন্দ সমীপে গিয়েছিলেন। চন্দননগরে এবং পণ্ডিচেরিতে আশ্রম-জীবনের প্রথম দিকের কিছু মূল্যবান বিবরণাদি মতিলাল লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর 'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থে। এই সুবৃহৎ পুস্তকটি তাঁর পত্নীর স্মৃতিকথার সূত্রে রায় মশায়েরই বিচিত্র কর্মকাণ্ড

ও অভিজ্ঞতায় ভরা অকপট আত্মজীবনী।

অরবিন্দ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রসঙ্গটিও 'জীবনসঙ্গিনী'তে প্রকাশিত। সেটি উদ্ধৃত করবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কি ধারণা ছিল তা স্মরণযোগ্য। ঠাকুরের বিষয়ে তাঁর সেই সব উক্তি প্রকাশ পায় তাঁর সম্পাদিত 'ধর্ম' প্রমুখ পত্রিকায় এবং প্রণীত 'কারাকাহিনী' পুস্তকে। অরবিন্দ-রামকৃষ্ণের যুগ্ম প্রসঙ্গের পটভূমি রূপেও এই পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

'ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' নিবন্ধে ('ধর্ম' সামায়িকপত্রে) তিনি লেখেন—'পাঁচশত বিগত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের মত দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি।'

ঠাকুরের বিষয়ে তাঁর নানা উচ্ছ্বসিত প্রশস্তির অন্যতম হ'ল—'আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য মতবাদে বিশ্বাসী কেউ হয়ত বলবেন, এ জ্ঞানহীন। সে কি জানে? আমি আধুনিক শিক্ষা পেয়েছি, আমায় কি শেখাবে? কিন্তু শুধু ভগবান জানেন, কি কাজ তিনি আজ ঘটাচ্ছেন। তিনিই এঁকে বাংলায় পাঠিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরতলে বসিয়েছেন, আর আজ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম পূর্ব থেকে শিক্ষিত মানুষরা—যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাত্যের সমস্ত শিক্ষা যাঁদের আয়ত্তে তাঁরা এই তপস্বীর পায়ে এসে পড়ছেন।'

(প্রায় এই ধরনের শ্রদ্ধা বিবেকানন্দ নিবেদন করেছেন তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে, কোন কোন বক্তৃতায়)।

ভারতের জাতীয়তা ও আধ্যাত্মিকতা, স্বাদেশিকতা ও ধর্মের মেল-বন্ধন ঘটেছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, ভাবধারায়। ভারতীয়ত্ব তথা অধ্যাত্মের অপূর্ব সমীকরণ তিনি ঋষিদৃষ্টিতে করেছিলেন। পরমহংসদেব

সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতেও সেই একীকরণ প্রকাশ পায় আলোচ্য সময়েই—

'যিনি পূর্ণ, যিনি অতীত অবতারদের সমষ্টি স্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেননি বা সে বিষয়ে কিছু বলেননি—একথা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস, যা তিনি মুখে বলেননি, তা কাজে করে গেছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে নিজের সামনে বসে গঠিত করে গেছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন, বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমিকতা তাঁর নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁর পূজ্যপাদ গুরুদেবের দান।'

ভারতের নব-জাগৃতি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভূমিকা বা তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্য আর কে এমন সগৌরবে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলেছেন সেই 'স্বদেশী যুগের' আত্মসমীক্ষাকালে?

ঠাকুরের বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা যে কি অচলা ছিল তার একটি বাস্তব নিদর্শন তিনি রেখেছিলেন। পরমহংসদেবের স্মৃতি-পূত দক্ষিণেশ্বরের কিছু মাটি তিনি আপন কক্ষে সংরক্ষণ করেন সেই রাজনৈতিক ঘনঘটার কালেই। তাঁর ঘর খানাতল্লাসীর সময় সেই মাটি নিয়ে পুলিশ কর্তার যে সন্দেহ জাগে তার উল্লেখও আছে তাঁর 'কারাকাহিনী' পুস্তকে। সেই বিবৃতিচ্ছলেই স্বদেশীয় মুক্তি-আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ ভূমিকা তথা প্রভাবের কথাও সুস্পষ্ট বলেছেন নিজে—'ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের মাটি রাখা ছিল, ক্লার্ক সাহেব (পুলিশ অফিসার) তা বড় সন্দিগ্ধ মনে দেখতে থাকেন। তাঁর বড় সন্দেহ হয় এটা কোন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণশীল পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ যে ভিত্তিহীন

তা বলা যায় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অরবিন্দের সশ্রদ্ধ ধারণাদি এই প্রশস্তিগুলি থেকে বোঝা যায়। আর উদ্ধৃত করা বাহুল্য। এখন অরবিন্দ-জীবনের সেই পর্যায়ে—রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে যখন তিনি যোগজীবনে আত্মসমাহিত হতে চলেছিলেন—তাঁর সম্পর্কিত কিছু অন্তরঙ্গ বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী মতিলাল রায়ের উক্ত গ্রন্থ থেকে উৎকলিত করা হবে। চন্দননগরে অরবিন্দের একান্তবাস কালে দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন রায় মশায়—'সারা মধ্যাহ্ন তিনি যোগ সম্বন্ধে আমায় শিক্ষা দিতেন। সেই সময় চতুর্ব্যূহ ভগবততত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইয়াছিল মনে আছে। ···অবতার সম্বন্ধে তিনি প্রাজ্ঞ ও বিরাট প্রকাশের উদাহরণ দিলেন। ব্যাসকে প্রাজ্ঞ ও কৃষ্ণকে বিরাট পুরুষ বলিয়া আমায় কত বুঝাইতেন। উপনিষদের তত্ত্ব তিনি মুক্তকণ্ঠে বিবৃত করিতেন। সারা মধ্যাহ্ন যে কি আনন্দে যে অতিবাহিত হইত তাহা বলিবার নয়।'

অরবিন্দের নিজেরও বিপুল প্রজ্ঞা কেবল মতিলালের কাছে প্রকাশ পায়নি, তাঁর মহাযোগী সত্তারও আভাস আছে মতিলালের বিবরণে। কখনো অরবিন্দ স্বয়ং তাঁর কাছে কিছু কিছু বিবৃত করেন। কখনো মতিলাল চাক্ষুষ লক্ষ্য করেছিলেন সেই প্রাক্-পণ্ডিচেরি পর্যায়ে—

'তাঁর বন্দী জীবনে যে সব অপূর্ব রহস্যের অনুভূতি হইয়াছিল, তিনি তাহা একে একে বলিতেন। আমি শুনিয়া বিভোর হইতাম। কেমন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে তিনি শূণ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন··· সর্বভূতে দিব্য অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—অনর্গল এই সকল কথা তিনি বলিয়া যাইতেন।···'

'আমি দেখিয়াছিলাম—তিনি যখন মাটির উপর দিয়া চলিতেন, যেন ভূমির উপর পা পড়িত না, কেমন আল্‌গা আল্‌গা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আসিয়া তিনি দাঁড়াইতেন।....

আর একটা আচরণ স্পষ্ট দিনের মত মনে পড়ে। তাঁর চক্ষের দৃষ্টি যেন মানুষের চাহনি বলিয়া আমার মনে হয় নাই, কে যেন তাঁর চক্ষুর ভিতর দিয়া আমায় স্পর্শ করিতেছে।...

শ্রীঅরবিন্দ প্রায় উর্ধ্বদৃষ্টিতে থাকিতেন। যখন কথা বলিতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'আপনি ঐরূপ এক দৃষ্টিতে কি দেখেন?' তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমার বুকে আজও উজ্জ্বল ভাবেই আঁকা আছে। তিনি বলিলেন, 'কতকগুলা লিপি ভাসিয়া আসে, উহাদের অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করি।' আবার একথাও তিনি বলিয়াছিলেন, 'অলক্ষ্য জগতে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের আকার ফুটিয়া উঠে। অক্ষরের মত এই সব মূর্তিও অর্থময়ী—কিছু জানাইতে চাহে, সেগুলিও আবিষ্কার করিতে যত্ন করি (ঐ পুস্তক, পৃঃ ১৩০-১৩১)।'

এমনি কথাপ্রসঙ্গে মতিলালকে অরবিন্দ জানিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রসঙ্গটি। বোমা মামলার সমকালীন অরবিন্দের এই উক্তি। মতিলাল লিখেছেন—(পৃঃ ১২৩) 'গ্রে স্ট্রীট হইতে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া, একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া তাঁহাকে যখন লালবাজার পুলিশ কোর্টে আনা হইতেছিল, তাঁর সম্মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারাক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা ভরসা দিয়াছিলেন—তাঁর মুখে এসকল কথাও শুনিয়াছি।'

মনে রাখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন তার দু যুগ আগে।

—

গ্রন্থপঞ্জী

(১)	শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি	—	অক্ষয়কুমার সেন
(২)	শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা	—	” ”
(৩)	শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ	—	স্বামী সারদানন্দ
(৪)	গৌরী মা	—	দুর্গা পুরী
(৫)	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিকথা	—	হরিহর চট্টোপাধ্যায়
(৬)	শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত	—	বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল
(৭)	আমার জীবনকথা	—	স্বামী অভেদানন্দ
(৮)	বিবেকানন্দ স্বামীজীর ঘটনাবলী	—	মহেন্দ্রনাথ দত্ত
(৯)	স্মৃতিকথা	—	স্বামী অখণ্ডানন্দ
(১০)	শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা	—	স্বামী গম্ভীরানন্দ
(১১)	ভারতের সাধক	—	শঙ্করনাথ রায়
(১২)	জীবন সঙ্গিনী	—	মতিলাল রায়
(১৩)	যুগনায়ক বিবেকানন্দ	—	স্বামী গম্ভীরানন্দ
(১৪)	শ্রীমা সারদাদেবী	—	” ”